কুন্তলীন পুরস্কারের

(দ্বাদশ প্রথম)।

(১৩০৩—১৩১৫)

প্রকাশক—

এইচ বসু, পারফিউমার,

দেলখোস হাউস, কলিকাতা।

১লা বৈশাখ, ১৩১৭।

কুন্তলীন প্রেস,

৬১, ৬২, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য আট আনা মাত্র।

সূচীপত্র।
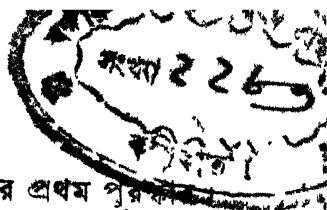
প্রথম বৎসরের প্রথম পুরস্কার

নিরুদ্দেশের কাহিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গত বৎসর এই সময়ে এক অত্যাশ্চর্য্য ভৌতিক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। যাহা লইয়া সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগতে আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। এই বিষয় লইয়া বিলাতের Nature, ফরাসী দেশের La Nature এবং মার্কিন দেশের Scientific Americanএ অনেক লেখা লেখি চলিয়াছে— কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছু মীমাংসা হয় নাই।

২৮এ সেপ্টেম্বর তারিখে Englishman কাগজে সিমলা হইতে এক তারের সংবাদ প্রকাশ হয়—

Simla Meteorological Office, ২৭এ সেপ্টেম্বর।

"বঙ্গোপসাগরে শীঘ্রই ঝড় হইবার সম্ভাবনা।"

২৯এ তারিখের কাগজে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইল,

Meteorological Office, 5, Russel Street.

"দুই দিনের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। ডায়মণ্ড হারবারে Danger-Signal উঠান হইয়াছে।"

৩০এ তারিখে যে Special Bulletin বাহির হইল তাহা অতি ভীতিজনক—

"আধ ঘণ্টার মধ্যে Barometer দুই ইঞ্চ নামিয়া গিয়াছে। আগামী কল্য ১০ ঘটিকার মধ্যে কলিকাতায় অতি প্রচণ্ড ঝড় হইবে, এরূপ তুফান বহু বৎসর মধ্যে হয় নাই।"

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট হইতে ডায়মণ্ডহারবারের Sub-Divisional Officerএর নিকট তারে খবর হইল—"Stop all outgoing vessels" এই সংবাদ মুহূর্ত্তের মধ্যে কলিকাতায় প্রচার হইল।

কলিকাতার অধিবাসীরা সেই রাত্রি কেহই নিদ্রা যায় নাই। আগামী কল্য কি হইবে তাহার জন্য সকলে ভীত চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

Reuterএর Agent *Times*এ telegraph করিলেন—"The Capital of our Indian Empire in danger."

১লা অক্টোবর আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল। দুই চার ফোটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

সমস্ত দিন মেঘাবৃত ছিল, কিন্তু বৈকালে ৪ ঘটিকার সময় হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। ঝড়ের চিহ্নমাত্রও রহিল না।

তারপর দিন Meteorological Office খবরের কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন—

"কলিকাতায় ঝড় হইবার কথা ছিল, বোধ হয় উপসাগরের কূলে প্রতিহত হইয়া ঝড় অন্য অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।"

ঝড় কোন্ দিকে গিয়াছে তাহার অনুসন্ধানের জন্য দিক্ দিগন্তরে লোক প্রেরিত হইল কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারপর Englishman লিখিলেন—এত দিনে বুঝা গেল যে বিজ্ঞান সর্ব্বৈব মিথ্যা।

Daily News লিখিলেন যদি তাহাই হয় তবে গরিব টেক্সদাতাদিগকে পীড়ন করিয়া Meteorological Office এর ন্যায় অকর্ম্মণ্য আফিস রাখিবা লাভ কি?

তখন Pioneer, Civil & Military Gazette, Statesman, তার স্বরে বলিয়া উঠিলেন—উঠাইয়া দেও।

গবর্ণমেণ্ট বিভ্রাটে পড়িলেন। অল্প দিন পূর্ব্বে Meteorological Officeএর জন্য লক্ষাধিক টাকার ব্যারোমিটার থার্ম্মোমিটার আনান হইয়াছে। সেগুলি এখন ভাঙ্গা শিশি বোতলের মূল্যেও বিক্রয় হইবে না। আর Meteorological Officeএর বড় সাহেবকে অন্য কি কার্য্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে?

গবর্ণমেণ্ট নিরুপায় হইয়া কলিকাতা Medical Collegeএ লিখিয়া পাঠাইলেন "আমরা ইচ্ছা করি Medical Collegeএ একটি নূতন Chair স্থাপিত হয়। নিম্নলিখিত বিষয়ে Lecture দেওয়া হইবে—'On the effect of variation of Barometric Pressure on the Human System'"

Medical Collegeএর Principal লিখিয়া পাঠাইলেন—"উত্তম কথা, বায়ুর চাপ কমিলে ধমনী স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি হয়। তাহাতে সচরাচর আমাদের যে স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে পারে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে কলিকাতাবাসীরা আপাততঃ বহুবিধ চাপের নীচে আছে ঃ—

প্রথম চাপ	বায়ু	প্রতিবর্গ ইঞ্চে	১৫	পাউণ্ড
২য়	ম্যালেরিয়া	"	২০	"
৩য়	পেটেণ্ট ঔষধ	"	৩০	"
৪র্থ	ইউনিভার্সিটি	"	৫০	"
৫ম	ইনকমট্যাক্স	"	৮০	"
৬ষ্ঠ	মিউনিসিপাল ট্যাক্স	"	১	টন।

বায়ুর ৩।১ ইঞ্চি চাপের ইতর বৃদ্ধি 'বোঝার উপর শাকের আটি' স্বরূপ হইবে। সুতরাং কলিকাতায় এই Chair স্থাপন করিলে বিশেষ উপকার যে হইবে এরূপ বোধ হয় না।

তবে সিমলা পাহাড়ে বায়ুর চাপ ও অন্যান্য চাপ অপেক্ষাকৃত কম। সেখানে উক্ত Chair স্থাপিত হইলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।"

ইহার পর গবর্ণমেণ্ট নিরুত্তর হইলেন। Meteorological আফিস এবারকার মত অব্যাহতি পাইলেন।

কিন্তু যে সমস্যা লইয়া এত গোল হইল, তাহা পূরণ হইল না।

একবার এক বৈজ্ঞানিক Natureএ লিখিয়াছিলেন বটে: তাঁহার Theory এই যে কোন অদৃশ্য ধূমকেতুর আকর্ষণে বায়ুমণ্ডল আকৃষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ বলিলেন যে, সেই সময় ছোট লাট ডায়মণ্ড-হারবার পরিদর্শন করিতে যান। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। তাঁহার ভয়ে ঝড় পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিয়াছে।

এসব অনুমান মাত্র। এখনও এ বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। এবার Oxford British Associationএ Herr Stürm

F. R. S. "On a vanished Typhoon" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। তাহা লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইবার সম্ভাবনা।

এই ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব পৃথিবীর মধ্যে এক জন মাত্র জানে সে আমি।

পরের অধ্যায়ে ইহা বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গত বৎসর আমার ভয়ানক জ্বর হইয়াছিল। প্রায় একমাস কাল শয্যাগত ছিলাম।

ডাক্তার বলিলেন সমুদ্র যাত্রা করিতে হইবে, নতুবা পুনরায় জ্বর হইলে বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। আমি জাহাজে Ceylon যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলাম।

এতদিন জ্বরের পর আমার মস্তকের ঘন কুন্তল রাশি, একান্ত বিরল হইয়াছিল। এক দিন আমার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বাবা, দ্বীপ কাহাকে বলে?" আমার কন্যা ভূগোল তত্ত্ব পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমার উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিল "এই দ্বীপ" ইহা বলিয়া প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় আমার বিরল-কেশ মস্তক মস্তকে দু এক গোছা কেশের মণ্ডলী দেখাইয়া দিল।

তারপর বলিল "তোমার ব্যাগে এক শিশি 'কুন্তলীন' দিয়াছি জাহাজে প্রত্যহ ব্যবহার করিও, নতুবা নোণা জল লাগিয়া এই দু একটি দ্বীপেরও চিহ্ন থাকিবে না"।

২৮এ তারিখে আমি Chusan জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিলাম। প্রথম দুদিন ভালরূপই গেল। ১লা তারিখ প্রত্যুষে সমুদ্র এক অস্বাভাবিক মূর্ত্তি ধারণ করিল, বাতাস

একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, সমুদ্রের জল পর্য্যন্ত সীসার রঙ্গের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল।

জাহাজের কাপ্তানের বিমর্ষ মুখ দেখিয়া আমরা ভীত হইলাম। কাপ্তান বলিলেন যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, অতি সত্বরই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। আমরা কূল হইতে বহু দূর—এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা।

এই সংবাদ শুনিয়া জাহাজে যেরূপ ঘোর শোক ও ভীতিসূচক কলরব হইল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। চারিদিক মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্ধকার হইল। এবং দূর হইতে এক এক ঝাপটা আসিয়া জাহাজখানাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

তারপর মুহূর্ত্তমধ্যে যাহা ঘটিল তাহার সম্বন্ধে আমার কেবল এক অপরিষ্কার ধারণা আছে—পাতালপুরী হইতে যেন রুদ্ধ দৈত্যগণ একেবারে নির্ম্মুক্ত হইয়া পৃথিবী সংহারে উন্মত্ত হইল।

সমুদ্র, বায়ুর গর্জ্জনের সহিত স্বীয় মহাগর্জ্জনের সুর মিলাইয়া সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিল।

তারপর অনন্ত ঊর্ম্মি রাশি, একের উপর অন্যে আসিয়া একেবারে জাহাজ আক্রমণ করিল।

এক মহা ঊর্ম্মি আসিয়া জাহাজের উপর দিয়া চলিয়া গেল—মাস্তুল, Life Boat ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল।

আমাদের অন্তিম কাল উপস্থিত। মুমূর্ষু সময়ে লোকে যেরূপ জীবনের প্রিয় বস্তু স্মরণ করে, সেইরূপ আমার প্রিয় জনের কথা মনে হইল। আশ্চর্য্য এই আমার কন্যা আমার বিরল কেশ লইয়া যে উপহাস করিয়াছিল, এ সময়ে তাহা পর্য্যন্তও স্মরণ হইল—

"বাবা এক শিশি কুন্তলীন তোমার ব্যাগে দিয়াছি।"

হঠাৎ এক কথায় আর এক কথা মনে পড়িল। বৈজ্ঞানিক কাগজে ঢেউয়ের উপর তৈলের প্রভাব সম্প্রতি পড়িয়াছিলাম। তৈল যে চঞ্চল জলরাশিকে মসৃণ করে এ বিষয়ে অনেক ঘটনা মনে হইল।

অমনি আমার ব্যাগ হইতে কুন্তলীনের শিশি খুলিলাম। তাহা লইয়া অতি কষ্টে ডেকের উপর উঠিলাম। জাহাজ টলমল করিতেছিল।

উপরে উঠিয়া দেখি সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পর্ব্বত প্রমাণ ফেনিল এক মহা ঊর্ম্মি জাহাজ গ্রাস করিবার জন্য আসিতেছে।

আমি 'জীব আশা পরিহরি' সমুদ্র লক্ষ্য করিয়া কুন্তলীন বাণ নিক্ষেপ করিলাম। ছিপি খুলিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, মুহূর্ত্ত মধ্যে তৈল সমুদ্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ইন্দ্রজালের প্রভাবের ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যে সমুদ্র প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। কমনীয় তৈল স্পর্শে বায়ুমণ্ডল পর্য্যন্ত শান্ত হইল। ক্ষণ পরেই সূর্য্য দেখা দিল।

এইরূপে আমরা নিশ্চিত মরণ হইতে উদ্ধার পাই। এবং এই কারণেই সেই ঘোর বাত্যা কলিকাতা স্পর্শ করে নাই। কত সহস্র সহস্র প্রাণী যে এই সামান্য এক বোতল কুন্তলীনের সাহায্যে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে?

শ্রী——

পুঃ—প্রায় ছয় মাস পরে Scientific Americanএ উপরোক্ত ঘটনার নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির হইয়াছিল——

THE SOLUTION OF A MYSTERY.

The vanished cyclone of Calcutta remained so long a mystery to vex the soul of meteorologists. We are now glad to be able to offer an explanation of this seeming departure from all known laws that govern atmospheric disturbances.

It would appear that a passenger on board the *Chusan* threw overboard a bottle of KUNTALINE while the vessel was in the Bay of Bengal, and the storm was at its height. The film of Oil, spread rapidly over the troubled waters, and produced a wave of condensation, thus counteracting the wave of rarefaction to which the cyclone was due. The superincumbent atmosphere being released from its dangerous tension, subsided into a state of calm. Thus by the merest chance, a catastrophe was averted.—*Scientific American.*

এই উৎকৃষ্ট গল্পের লেখক নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুসারে পুরস্কার (৫০৲ টাকা) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত রবিবাসরিক নীতিবিদ্যালয়ে দেওয়া হইয়াছিল। সেই বৎসরের নিয়মাবলীতে রচনাকারীর নামোল্লেখ সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম না থাকায় আমরা বাধ্য হইয়া এই পুরস্কার দিয়াছিলাম।

দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম পুরস্কার।

পূজার চিঠি।

ভাগলপুর
৬ই অক্টোবর, ১৮৯৬।

প্রাণাধিক,

কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যেন আমি খোকাকে লইয়া জানালায় বসিয়াছি, ঝি আসিয়া তোমার চিঠি দিয়া গেল। চিঠি খুলিয়া পড়িবার আগেই কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিল। মনটা ভারি বিষণ্ণ হইল; আহা, যাহা স্বপ্ন দেখিলাম, তাহা যদি সত্য হইত! অথচ এই সেদিন তোমার চিঠি পাইয়াছি, এত শীঘ্র আবার চিঠি আসিবার কিছু কথা নহে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই মিটে না যে বলে, তাহা কিন্তু যথার্থ। স্বপ্নটা মনে বড় বেদনা দিতে লাগিল। বাল্যকালে একটি কবিতা পড়িয়াছিলাম, তাহার কথাগুলি মনে নাই, ভাবটা এই যে, যে ব্যক্তি স্বপ্নে সুখী হয়, সে জাগে কাঁদিবার জন্য;—তাহার পর বিদ্যুতের সঙ্গে একটা তুলনা দেওয়া ছিল, সেটা আমি বিলকুল ভুলিয়া গিয়াছি (আমার স্মরণ-শক্তির যা তেজ তাহা তোমার কাছে অবিদিত নাই—তুমি অল্প দুঃখে আমাকে লেখাপড়া শিখান হইতে বিরত হও নাই) যাহা হউক, তখন তিনটা বাজিয়াছে, খোঁকাকে উঠাইয়া দুধ খাওয়াইলাম; দুধ খাইয়া খোকা ঘুমাইতে

লাগিল। একটা কথা আছে, কোন স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গিলে বাকি রাতটুকু যদি আর ঘুমান না যায়, তবে সে স্বপ্ন সফল হইতে পারে; সুতরাং আর ঘুমাইবনা স্থির করিলাম। কি করি? মনে করিলাম, একখানা বই টই লইয়া পড়ি; তাহার পর মনে হইল, যদিও না ঘুম পাইত, বই হাতে করিলে ত জাগিয়া থাকা একেবারেই অসম্ভব হইবে। এই ভাবিয়া তোমার কতকগুলি চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে বসিলাম।

এ গুলি সব এবার তোমার গ্রীষ্মের ছুটির পর কলিকাতায় গিয়া লেখা। এক একখানি করিয়া চিঠি পড়িতে লাগিলাম, আর আমার অতীত দিনের কথাগুলি একে একে মনে উদয় হইতে লাগিল। এদিনের সঙ্গে সেদিনের কত প্রভেদ! আমি এখন যে অবস্থায় আছি, বোধ হয় প্রেমিক প্রেমিকার এই অবস্থাই সুখের। আজ কাল আসিবে, ইহাতে বড়ই আনন্দ। যখন মিলন হয়, তখন কেমন করিয়া কোথা দিয়া যে দিন কাটিয়া যায়, কিছু বোঝা যায় না। তারপর বিরহের ক্রন্দন আরম্ভ হয়। তাহার পর যখন আবার পুনর্ম্মিলনের দিন অত্যন্ত নিকটিয়া আসে, তখন বড় সুখ। সূর্য্য উঠিবার অনতিপূর্ব্বে যেমন আকাশ বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত হইয়া উঠে, তেমনি এ সময়ও মনটাময় ছবি আঁকিয়া যায়। শুনিতে পাই, স্বর্গে চিরমিলন। তাহা কি তত সুখের? আমি যদি বিশ্বকর্ম্মা হইতাম (বিশ্বকর্ম্মাই স্বর্গ গড়িয়াছিল, না কে? কে জানে বাবু, রামায়ণ টামায়ণ অত আমার মনে নাই) তবে এমন স্বর্গ গড়িতাম, যে প্রতি প্রেমিক প্রেমিকার মনে হইত, আমার হৃদয়নিধি আজি কালি ফিরিয়া আসিবেন। যাহা হউক, তোমার চিঠিগুলি পড়িতে লাগিলাম, আর আমি যত

কাঁদিয়াছি, যত নিশ্বাস ফেলিয়াছি সব মনে পড়িতে লাগিল। তুমি যখন কাছে থাক, তখন মনে হয়, ছাড়িয়া গেলে নাকি আবার বাঁচিয়া থাকা যায়! সেই তুমি বিদেশে চলিয়া যাও, অথচ বাঁচিয়া থাকি; কিন্তু দগ্ধ হইয়া বাঁচিয়া থাকি। বাড়ীতে এত লোকজন, ছেলে পিলে, কিন্তু সব যেন খালি খালি বোধ হইত। সমস্ত জিনিষপত্র যাহা তুমি ব্যবহার করিতে, সমস্ত যেন তোমাকে স্মরণ করিয়া কাঁদে মনে হইত। ঐ চেয়ারে তুমি বসিয়া পড়িতে, তোমার চেয়ার খানিতে আমি গিয়া বসিয়া থাকিতাম। মনে মনে অনুভব করিতাম, আমি শ্রীমতী সুরবালা দেবী নহি; আমি শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,--প্রেসিডেন্সি কলেজে এম, এ পাঠ করি, এবং সিটি কলেজে আইনের শ্রেণীতে হাজীরা লেখাইয়া অন্যের অলক্ষিতে পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়ি; আপাততঃ ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছি। এই মনে করিয়া "সুরি" "সুরি" করিয়া ডাকিতাম; নিজেই "সুরি" সাজিয়া তাহার উত্তর দিতাম; কত কথা হইত, গল্প হইত, হাস্য পরিহাস হইত। খোকা যেই কাঁদিয়া উঠিত, আমি ছুটিয়া পালাইয়া গিয়া শয্যায় আরোহণ করিতাম। খোকাকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে তাহার মুখখানি দেখিতাম, ঠিক যেন ছোট তুমি! মা বলেন, ছেলেবেলায় ঠিক তুমি খোকার মত ছিলে। খোকার পানে চাহিয়া চাহিয়া তবু অনেক পরিমাণে সান্ত্বনা পাইতাম। সকলে বলে, মা মেয়েকে বেশী ভাল বাসে, বাপ ছেলেকে বেশী ভাল বাসে। আমার কিন্তু সেটা খুব স্বাভাবিক মনে হয় না। মা ছেলেকে বেশী ভাল বাসিবে, কারণ সেই কোমল শিশুর মুখে তাহার প্রিয়তমের মধুমূর্ত্তির আভাস দেখা যায়; এবং ঠিক এই কারণে বাপ মেয়েকে বেশী ভাল বাসিবে। খোকা যদি

না হইত, তবে তোমার বিরহ কেমন করিয়া সহ্য করিতাম কে জানে !

আমার বিরহকালের দ্বিতীয় সঙ্গী ছিল ঐ ঘড়িটি। আমার এ শয়নকক্ষে খোকা ছাড়া ঐ একমাত্র সজীব পদার্থ। অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত ; সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ, কিন্তু ও বেচারীর নিদ্রা নাই---টক্ টক্ টক্ টক্। ভাবিতাম, এ আমাদের কিনা জানে ? কিনা দেখিয়াছে ? সেই ফুলশয্যা-রাত্রে আমাকে কথা কহাইবার জন্য তোমার সাধাসাধি হইতে আরম্ভ করিয়া, সেই ৪ঠা আষাঢ় ভোর রাত্রে তোমার বিদায় গ্রহণের দৃশ্য পর্যান্ত, সব কথারি এ সাক্ষী আছে। ইহাকে কত কথা বলি কিন্তু কোনও কথা কাণে তুলে না, এই একটা এর ভারি দোষ ! এ যদি আমার সুখে সুখী হয়, দুঃখে দুঃখী হয়, তাহা হইলে আর ভাবনা কি ? তুমি যখন আসিবে তখন ইহাকে বলিতাম, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র বাজাইয়া দে, তার পর আ—স্তে আ—স্তে আ—স্তে চলিবি। দশটা হইতে এগারোটা আর বাজে না ! এগারোটা বাজিল ত আর বারটা বাজিতে চাহে না ! চারিটা বাজিয়া গিয়াছে, তবু আর রাত্রি পোহায় না ! সময় চুরি করিতে তাহাকে বলি না। দিনের বেলায় খুব শীঘ্র শীঘ্র চলিলেই ত হইল ! চব্বিশ ঘণ্টায় দিনমান ত ? সকাল ছয়টা হইতে রাত্রি দশটা অবধি এই ষোল ঘণ্টা, চারি পাঁচ ঘণ্টায় চলিয়া সমস্ত রাত্রে বাকী সময়টা পোষাইয়া নাওনা বাবু ! আর এখন ? এখন বলি, তোর কাঁটা গুলো বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরাইয়া ২৫ শে আশ্বিনের সন্ধ্যা আনিয়া দে। তা সে শুনিবে না—সেই টক্ টক্ টক্ টক্—গা জ্বলে যায় ! একটু জোরে চল না মুখপোড়া ! খেতে পাও না ? তুমি যে কেবলা

চাকরের বাপ হলে! তুই তোকারি করিলে, গালি দিলে না শুন, তুমি বলিব, আপনি বলিয়া কথা কহিব! হাতযোড় করিয়া, গলবস্ত্র হইয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে প্রস্তুত আছি--স্তব করিতেও আপত্তি নাই। রবিবারে রবিবারে দম পায়, প্রত্যহ স্বহস্তে দুই বেলা দম দিব স্বীকার করিতেছি, এতেও সে শুনে না। কাঁটা দুটা ভাঙ্গিয়া ডায়েলে কালি ঢালিয়া দিলে তবে রাগ যায়।

এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে চিঠি পড়িতে লাগিলাম। ক্রমে সকাল হইয়া গেল। তখন সব তুলিয়া রাখিয়া উঠিতে হইল। মনে হইতে লাগিল, আজ আমার চিঠি আসিবেই, কেহই রোধ করিতে পারিবে না। কতবার ভাবিলাম হে ঠাকুর, যদি স্বপ্ন দিলে, তবে আজ আমার একখানি চিঠি আনাইয়া দাও। অনেক কষ্টে বেলা দশটা অবধি কাটিল। সাড়ে দশটার মধ্যে চিঠি আসিবে। আমি তখন রান্না ঘরে; উৎকণ্ঠায় ডালে দুই তিনবার নুণ দিয়া ফেলিয়াছি, মাছগুলো ভাজিতে গিয়া এক পিঠ পোড়াইয়া কালো করিয়া দিয়াছি, আনমনে জলের ঘটিটা ফেলিয়া দিয়া ঘরের মেঝেতে আথাব পাথার খেলাইয়াছি। মা আসিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বকুনি ধরিলেন। আমি ছুটিয়া পথের ধারের জানালায় গিয়া বসিলাম;—বকুনি শুনিবার আমার অবসর কোথায়? চিকের আড়াল হইতে দেখিতে লাগিলাম। কত লোকজন, গাড়ি ঘোড়া, খাবারওয়ালা, জুতো সেলাই বুরুষ, কনেষ্টবল, ভিকারী, স্কুলের ছেলে, আপিসের বাবু যাইতেছে, আসিতেছে, কিন্তু ডাকওয়ালার দেখা নাই। রাস্তার যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে, এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা লাল পাগড়ী দেখা গেল। বলিহারি, ইংরাজের কি বুদ্ধি রে!

ডাকওয়ালার মাথায় লাল পাগড়ি কেন? না অনেক দূর হইতে অনেক লোকের মাঝে সে আসিতেছে দেখা যাইবে বলিয়া। ক্রমে সে নিকটে আসিল, হায় হায়; ডাকওয়ালা নহে, চাপরাশি! চুলোয় যাউক! ইংরাজ, যদি এত বুদ্ধি ধর,— তবে ডাকওয়ালা ছাড়া অন্য কাহাকেও লাল পাগড়ি পরিতে দাও কেন? আইন করিয়া ইহা দমন করা উচিত। ব্যবস্থাপক সভার মাননীয় সভ্যগণ এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন না কেন? তাহাদের কি স্ত্রী নাই? তাঁহারা কি এমনি করিয়া প্রবাসী স্বামীর পত্রের প্রতীক্ষায় জানালায় বসিয়া থাকিয়া কখনও আমার মত নির্দ্দয় ভাবে প্রতারিত হন নাই? যাহা হউক ক্রমে ডাকওয়ালা আসিল। দরজায় চাকরের হস্তে "চিট্‌ঠি" এই শব্দ করিয়া চিঠিগুলি দিয়া গেল। আমি নিশ্বাস বন্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দুই তিন মিনিটের পর ঝি আসিয়া আমার হাতে লেফাফা দিল; গোলাপী রঙ্গের সম চতুষ্কোণ খামখানি, তাহার উপরে তোমার হাতের গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—

শ্রীমতী সুরবালা দেবী।

* * * *

জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমার জন্য কি আনিতে হইবে? আমার জন্য আর কি আনিবে ভাই? আমাদের কি আর এখন সখ্ করিবার বয়স আছে? খোকা বাবুর জন্য ভাল দেখিয়া পোষাক লইয়া আসিও, পুতুল আনিও, দুই বাক্স বিস্কুট আনিও, আর যাহা যাহা ভাল দেখ তাহাই আনিও। আর অধিনীর জন্য যদি নিতান্তই কিছু আনিতে হয়, তবে একখানি টিয়ে রঙ্গের কাপড়, তাহার জমিটা হইবে টিয়া পাখীর গায়ের মত সবুজ, পাড় হইবে ঠোঁটের মত লাল। এক বোতল কুন্তলীন আনিও—এবার পদ্মগন্ধ

আনিও ; গোলাপগন্ধ সুবাসিত অনেকবার মাথা হইয়াছে। থান দুই লেবুর সাবান, এক বাক্স ভাল সোপ, দুই জোড়া জুবিলি চুড়ি—সরু গুলি আনিবে, মোটা গুলি ভাল দেখিতে নয় ; এক শিশি কুন্তলীনওয়ালাদের এসেন্স দেলখোস্ ; সাদা, কালো, ছাই রঙ্গের তিন বাণ্ডিল পশম, আর পার ত কোন ভাল দোকান হইতে একটি মাথায় পরিবার রূপার প্রজাপতি--এই গুলি আনিবে। অধিক আর কি লিখিব, আমাদের কি আর মানায় ? লোকে নিন্দা করিবে যে! মার জন্য একগাছি আসল রুদ্রাক্ষের মালা, বাবার জন্য একখানি মহানির্ব্বাণতন্ত্র পুস্তক আনিবে। আর আনিবে শ্রীযুক্ত বাবু অমলেন্দুকে ; অধিক টাকা না থাকে নবং আর কিছু আনিবার প্রয়োজন নাই ; শেষের লিখিত এই ফরমাসটি আনিলেই চলিবে ; কারণ ইহার দাম এক আনা মাত্র। ইতি

তোমার—

সুরো, সুরু--বা সুরি।

রচয়িত্রী শ্রীমতী রাধামণি দেবী।

জামালপুর।

তৃতীয় বৎসরের প্রথম পুরস্কার।

বিধবা।

অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা দান করিলে হিন্দুশাস্ত্র মতে মেয়েব পিতা মাতা গৌরীদানেব ফল লাভ করেন বলিয়া, চারুশীলার মা বাপ অনেক অনুসন্ধানে বিষ্ণুপুরে চাটুয্যেদের মেজছেলে অনীলমাধবের সহিত শুভদিন দেখিয়া আট বৎসব বয়সে চারুর বিবাহ দিয়াছিলেন। অনীলেব বয়স তখন চতুর্দ্দশ মাত্র; অনীলের পিতা অম্বিকা বাবুর কিছু জমীদারী ছিল, এবং তাহার মা কাত্যায়নী দেবীর সে বড় আদরে ছেলে, এই দুটি অনিবার্য্য কারণে প্রথম বয়সে ছেলেটার লেখা পড়ার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ দেওয়া হয় নাই, এবং গ্রামেব মাইনর স্কুল অপেক্ষা গ্রামপ্রান্তে জাম বাগানে অনীলকে মাসের মধ্যে অনেক দিন দেখা যাইত। লেখা পড়া, এমন কি অন্ন বস্ত্রের প্রতিও তাহার যে পরিমাণে ঔদাসীন্য ছিল, পরের গাছের ফলে ও পরের মুখের গা'লে তাহার সেরূপ অরুচি দেখা যাইত না। এই সংসারবিরাগী, আপন খেয়ালে আপনি বিভোর, অরণ্যচর মানবশিশুটিকে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করিয়া ভবকারাগারে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য তাহার স্ত্রৈণ পিতা ও মুগ্ধা জননীর এই প্রকার মহৎ উদ্যমের কি ফল ফলিবে তাহা কেহ অনুমান করিতে পারে নাই, কেবল বসন্তের এক সুমধুর মলয় মর্ম্মরিত মনোহর

প্রভাতে সর্ব্বদর্শী কাল শানাইয়ের তীব্র করুণস্বরে মৃত্যুভরা বিষাদ রাগিণীর মত একটি অনন্ত বিদায়ের ম্লান আভাস মৃদু সমীরণের সহিত বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত করিতেছিল।

লাল বেনারসী সাড়ী সমাবৃত অলঙ্কারবিমণ্ডিত আট বৎসরের সেই নোলকপরা বধূটি পাইয়া অনীলমাধবের কি বিপুল আনন্দ! উৎসাহে কয়েক দিনের জন্য তার গাছে চড়া ক্ষান্ত ছিল, দেশের পক্ষী-শাবকেরা কিছুকালের জন্য আপনাদিগের অটল মাতৃস্নেহ-পূর্ণ ক্ষুদ্র স্নিগ্ধনীড়ে নিরাপদ হইল, এবং অনীলের বন্ধুবান্ধবগণ রাজ্যের সুপক্ক ও অপক্ক ফলের পরিবর্ত্তে সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতি বিবিধ সুস্বাদু মিষ্টান্নে আপনাদিগের বন্ধুত্ব ঘনীভূত করিয়া তুলিল। তাহাদের মনে হইতে লাগিল, অনীলমাধব যেন তাহাদের সেকালের রাজপুত্র, আর তাহারা কেহ মন্ত্রীপুত্র, কেহ সওদাগর পুত্র, কেহ বা কোতোয়ালের পুত্র: কোন সোনার জাহাজে চড়িয়া সাগর পারের এক স্বপ্নময় দেশ হইতে যেন একটি সুন্দরী রাজকন্যাকে মধুময়ী বাসন্তী নিশায় সুপ্তিঘোর হইতে জাগাইয়া, তাহাদের রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া আনিয়াছে, এবং রাজকন্যার সঙ্গে যে রূপার কাটি ও সোনার কাটি ছিল, তাহাও তাহারা ফেলিয়া আসে নাই।

এই রূপার কাঁটি নববধূ চারুশীলার মিষ্টহাসি, আর সোনার কাটি তাহার সুমিষ্টতর অশ্রুধারা। মা বাপ ও ভাই বোনের কথা ভাবিয়া যখন তাহার মৃণালবিচ্ছিন্ন পদ্মের মত বিরহম্লান নত নেত্র দুটি হইতে অশ্রু গলিয়া পড়িত, তখন তাহা দুটি কনকধারা বলিয়াই মনে হইত।

২

পাঁচ বৎসর পরে গ্রামের স্কুলের লেখাপড়া শেষ করিয়া অনীল কলিকাতায় পড়িতে গেল। এখন সে সভ্য ভব্য

নবযুবক, তাহার বাল্যকালের চাপল্য অন্তর্হিত হইয়াছে; বিলাতী জুতা লেড্‌লর বাড়ীর সার্ট, সুবর্ণ চেন ও সুচারু টেরীশোভিত সেই নবযুবকটিকে দেখিয়া এখন একবার সন্দেহও হয় না, যে, সে কাঁচা পাকা ফল ও পক্ষীশাবকের সন্ধানে, পল্লীগ্রামের দুর্দ্দান্ত ছেলেদের দলপতিরূপে, গাছে গাছে ঘুরিয়া নিরুদ্বেগ শৈশব অতিবাহিত করিয়াছে। চারুর নব উন্মেষিত প্রেম পুষ্পকেশরের চতুর্দ্দিকে রক্তদল স্তবকের ন্যায় তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়াছে, এবং সেই প্রেমকুসুমের অরুণ আভায় তাহার তরুণ হৃদয় সুরঞ্জিত হইয়াছে।

কলিকাতায় আসিয়া অনীল প্রতি সপ্তাহে চারুকে দুই খানি করিয়া পত্র লিখিত, এবং উপর্য্যুপরি দুই দিন ছুটী পাইলেই সে "দারজিলিং মেলে" বাড়ী ছুটিয়া আসিত। কিন্তু অদৃষ্টের কি বিড়ম্বনা! চারুর প্রতি অনীলের এই স্বাভাবিক প্রেমাকর্ষণকে নিতান্ত অস্বাভাবিক নির্লজ্জতার চিহ্ন ভাবিয়া পল্লীরমণীগণ দত্তবাড়ীর মাধ্যাহ্নিক বৈঠকে এ বিষয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল, এবং পাড়ার "ফিমেল এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট" শ্রীমতী রূপো ঠাকুরঝি অনেক নজীর উদ্ধৃত করিয়া অনীলের মাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ছেলেকে এখন হইতে বৌর সঙ্গে বেশী মিশিতে দিলে, ছেলে ক্রমে তাহার গোলাম হইয়া পড়িবে এবং অবশেষে বৌ শাশুড়ীর উপরও কর্ত্তৃত্ব করিতে ছাড়িবে না। সেই হইতে অনীলের মা সাবধান হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, ছেলেকে অকারণে মধ্যে মধ্যে বাড়ী আসিতে দেখিলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন; একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, "সে কালই ভাল ছিল, শ্বশুর শাশুড়ী বাঁচিয়া থাকিতে আমি কখন

দিনের বেলা তোমার সম্মুখে আসিতেও সাহস করিতাম না, আর একালে বৌ গুলো হয়েছে বিবি, দিন নেই, দুপুর নেই, সকল সময়ে একত্রে মুখোমুখী হ'য়ে ইয়ারকি কর্‌বে।" সে দিন অনীল বাড়ী ছিল, এবং হঠাৎ কথাটা তাহার কাণে প্রবেশ করিয়াছিল, সে বুঝিল তাহাদেরই লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলা। মাতার উদার পুত্রস্নেহ ও স্বার্থনাশের আশঙ্কায় এমন সঙ্কুচিত হয় ভাবিয়া অনীল কিছু ক্ষুণ্ণ হইল, এবং তাহার সরল উদাসীন, মুক্তহৃদয়টিকে প্রেমরজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া, অবশেষে সেই বন্ধনপাশ লইয়া জননীর এই প্রকার হৃদয়হীন যথেচ্ছাচার তাহার নিকট একটা দুর্ব্বোধ্য রহস্য বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল।

তাহার পর হইতে অনীল ক্রমে বাড়ী আসা বন্ধ করিল, অভিমান করিয়া পূজার ছুটীতেও বাড়ী আসিল না, এবং পত্র লেখা একেবারে কমাইয়া দিল; এদিকে শাশুড়ীর কটূক্তি ও ননদের ব্যঙ্গোক্তিতে চারুকেও পত্রের সংখ্যা হ্রাস করিতে হইল, সে মাসের মধ্যে কদাচ একখানা লিখিত, কিন্তু তাহার প্রত্যেক ছত্রে এত অশ্রুমিশান ভালবাসা ঢালা থাকিত, যে অনীল সমস্ত অপরাহ্ণ ধরিয়া জন-সঙ্কুল কলিকাতার রথচক্র-মুখরিত সুবৃহৎ রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী এক সমুন্নত অট্টালিকা-চূড়ায় বসিয়া সেই অশুদ্ধ-বর্ণ-বিন্যস্ত পত্রখানি পড়িয়া পড়িয়া মুখস্ত করিয়া ফেলিত, এবং কিছুতেই তাহার পরিতৃপ্তি হইত না! অবশেষে শ্রান্ত রবি যখন পশ্চিম আকাশ বিচিত্র বর্ণে সুরঞ্জিত করিয়া পৃথিবীর প্রান্তে বিলুপ্ত হইতেন, ও পরিপুষ্ট শশধর আপনার সুবিমল সৌন্দর্য্যজ্যোতিতে ধরাতলে কুসুম-সুকোমল শুভ্রতা প্রস্ফুটিত করিয়া, মাধবের বক্ষঃবিলম্বিত শ্রেষ্ঠরত্নের ন্যায় পূর্ব্বগগনে সমুদিত হইতেন, তখন সংসারে সকল সুখ ও শোভা,

জগতের সমস্ত উচ্ছ্বসিত আনন্দ ও প্রীতি-কল্লোল অশরীরী আলোকবার্ত্তাময়, অনাবিল, অচঞ্চল জ্যোতির্ম্ময রূপে অনীলের অনেক দিনের বিষাদান্ধকার মলিন দুঃসহ বিরহ-বেদনাব্যাপ্ত হৃদয়স্তরকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিত। দীর্ঘকালের অনাবৃষ্টির পর বর্ষার নব বারিবর্ষণে শুষ্কপ্রায় শীর্ণ ধান্যগুচ্ছ মুকুলিত ও শ্যামল শীর্ষে কণ্টকিত হইয়া উর্দ্ধে যেমন আপনার বাগ্রবাহু উৎক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, তেমনি বহুদিনান্তে এক এক খানি প্রেমের পত্র চারুর বিরহ তাপ বিশুষ্ক হৃদয়কলিকাটি আশাবারি সিঞ্চনে মুকুলিত করিয়া তুলিত। সে তাহার বলয়বেষ্টিত মৃণালকোমল ক্ষীণ বাহুদুটি দ্বারা প্রিয়তমের কণ্ঠবেষ্টনের ক্ষুধিত আকাঙ্ক্ষাটিকে হৃদয়ের মধ্যে নব নব ভাবে পোষণ করিয়া একদুই করিয়া দিন গণিতে লাগিল।

৩

উভয়ের হৃদয়ের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা উভয়ে নিভৃত হৃদয়ের অন্তস্তলে সংগুপ্ত রাখিয়া এমনিভাবে তাহারা দূরে দূরে থাকিয়া কাল কাটাইতে লাগিল। শেষে কলিকাতায় অনীলের কঠিন পীড়া হইল, সংবাদ পাইয়া তাহার পিতা তাহাকে শীঘ্র বাড়ী আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন।

কলিকাতার মেসে শুশ্রূষার অভাব, তাহার উপর রোগের যন্ত্রণা, রোগক্লিষ্ট অবসন্ন দেহে অনীল বাড়ী আসিল; কতদিন পরে চারুর সঙ্গে তাহার দেখা! কত সময় তাহার মনে হইত, চারু যদি সমস্ত দিন তাহার শয্যাপ্রান্তে তাহার মাথার কাছে বসিয়া থাকে, তাহার কাছে বসিয়া যদি প্রেমপূর্ণ প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাহার কাতর মুখের দিকে সহানুভূতি-ভরে চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই নয়নামৃত সিঞ্চনেই বুঝি সে শীঘ্র সারিয়া উঠিতে পারে,

তাহার মানসিক প্রসন্নতা সমধিক বৰ্দ্ধিত হয়; কিন্তু মরিলেও বুঝি অদৃষ্টে সে সুখ ঘটিয়া উঠিবে না; সর্দ্দার খানসামা বলরাম এবং বুড়ী ঝি কৌশল্যা তাহার সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সেই কবিত্বশূন্য, আরাম-বিরহিত, আন্তরিকতাবর্জ্জিত নিয়মবদ্ধ শুশ্রূষার উৎপীড়নে অনীল একেবারে হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল, সে ভাবিত পক্ষীকে সোনার খাঁচায় পুবিয়া আদর করাও অনেকটা এই রকম। লোকে দেখে পক্ষীর সুখের, যত্নের, ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, কিন্তু অন্যে কেমন করিয়া জানিবে, যে তাহার আজন্মের আশ্রয়, তরুলতা-পূর্ণ মারুত-হিল্লোলিত বিমুক্ত বনস্থলীতে কত সুখ, কত শোভা, কত আনন্দ! বলি শত মূর্খ সঙ্গে লইয়া স্বর্গে যাইতেও অসম্মত ছিলেন; তেমনি ইহাদের সেবায় আরোগ্য লাভও তাহার প্রার্থনীয় ছিল না। চারু কখন কখন দিনান্তে একবারমাত্র তাহার কাছে আসিতে পাইত; স্বাধীনভাবে অসঙ্কোচে পীড়িত পতির সম্মুখে আসিবার তাহার অধিকার ছিল না, কারণ অনেকেই অনীলের এই রোগশয্যায় তাহার সহিত চারুর সাক্ষাৎ হওয়া নিষেধ করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ বহুদর্শী বিচক্ষণ কবিরাজ মহাশয় তাঁহার আয়ুর্ব্বেদ-সমুদ্র আলোড়নপূর্ব্বক এই ব্যবস্থা-সুধা উদ্ধার করিয়াছিলেন, যে রুগ্নাবস্থায় শ্রীমানের নিকট বধূমাতা উপস্থিত থাকিলে সহসা তাহার চিত্তবিকারের প্রাবল্যবশতঃ বায়ু কুপিত হইবে, সেই কুপিত বায়ুর আকুঞ্চন ও প্রসারণ জনিত প্রদাহে পিত্তের চঞ্চলতা বৃদ্ধি হইলেই কফের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী, এবং সেই কফ-পিত্ত-বায়ু এই ত্রিদোষাশ্রিত ধাতু মিশ্রিত ও একত্র হইয়া সুষুম্না ও ঈড়ার মধ্যবর্ত্তী যে নাড়ীতে সতেজে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত করিবে, নিদানের মতে "সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।"

কিন্তু এ সকল চিকিৎসাতত্ত্বে কর্ণপাত করিতে চারুশীলার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না। সে বাতায়ন প্রান্ত হইতে গোপনে অতি দীননয়নে তাহার রুগ্ন স্বামীর ম্লান মুখখানি অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত নিরীক্ষণ করিত। কতবার তাহার মনে হইত, উষাকালের অস্তগমনোন্মুখ চন্দ্রকলার পাণ্ডুর আভা তাহার যে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, অকালে সে মুখ হয়ত তাহার হৃদয়াকাশ হইতে চিরবিলুপ্ত হইবে, এবং প্রদীপ্ত দিবালোকের পরিবর্ত্তে তামসী নিশীথিনীর অনন্ত অন্ধকার ভিন্ন ভবিষ্যতের জন্য তাহার আর কিছুই সম্বল রহিবে না।

অবশেষে অনীলের দিন যখন ফুরাইয়া আসিল, তখন চারু কোন বাধাবিঘ্ন না মানিয়া স্বামীর রোগ-শয্যা-প্রান্তে উপস্থিত হইল, এবং তাহার মুখখানি আপনার অবসন্ন, বিদীর্ণপ্রায় বুকে তুলিয়া লইয়া তাহা অশ্রুবিধৌত করিয়া, মাটিতে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল। অনীল তাহার অন্তিমশ্বাস আকর্ষণপূর্ব্বক বলিল, "আমার জীবনের সকল আশাই অপূর্ণ রহিল, আমি অতি হতভাগ্য।' তাহার নিষ্প্রভনেত্রের অশ্রুধারা গড়াইয়া উপাধান সিক্ত করিল, চারুর হৃদয় সেই অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া গেল, তাহার মুখ হইতে একটাও সান্ত্বনার কথা বাহির হইল না, হতভাগিনী এখন আর কি বলিয়া প্রিয়তমকে সান্ত্বনা দান করিবে? প্রথম যৌবনে কালের অমোঘ কুঠারে নির্ম্মূলিত জীবনতরু পতনকালে তাহার আশ্রিতা আশালতাকে অবলম্বন করিয়া কোন কালে রক্ষা পাইয়াছে? চারুর সমস্ত ভাষা তাহার বুকের মধ্যে বাষ্পময় হইয়া তাহার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত করিতে লাগিল, তখন অনীল আবেগভরে তাহার বিশীর্ণ বিবর্ণ ওষ্ঠের মৃদুসংস্পর্শে চারুর উদ্বেগম্লান, কোমল, বিকম্পিত পুষ্পপুট-তুল্য ওষ্ঠাধর

সস্নেহে তেমনি করিয়া চুম্বন করিল, যেমন করিয়া বসন্ত শেষে বসন্তানীল নিশান্তে শিশিরসিক্ত প্রস্পন্দিত শিথিলবৃন্ত রজনী গন্ধার সুমন্দ স্নিগ্ধগন্ধটুকু এক নিশ্বাসে পান করিয়া ধরণীর ক্রোড় হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হয়।

অনীল চারুর হাতে তাহার ষ্টীলের 'ক্যাস্‌বাক্সটী'র চাবি দিয়া বলিল, "আমি এতকাল বিদেশে শুধু আমার জীবন মরণের দেবতারই ধ্যান করিয়াছি, অন্তরের অন্তঃপুরে একচিত্তে গৃহ-লক্ষ্মীর আবাহন করিয়াছি, তাই বাহিরের দেবী সরস্বতী বিরাগভরে বাহিরেই বিরাজ করিয়াছেন। আজ আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে সমর্পণ করিলাম, ইহাই আমার অন্তিম স্মৃতিচিহ্ন।" ইহার পর চারুর সহিত অনীলের আর কোন কথা হয় নাই।

সেই পনের বৎসর বয়সে সংসারে সুখের মুখ দেখিতে না দেখিতে মন্দভাগিনী চারু বিধবা হইল। যে রাত্রি তাহার অনন্ত বিষাদান্ধকারে চারুর সুখসৌভাগ্যভ্রষ্ট জীবন সমাচ্ছন্ন করিল, সেই ঘোরা, মেঘাবৃতা অমা নিশীথিনীর আর কখন অবসান হইবে না। মরণের কোন্ অনির্দ্দিষ্ট অদৃশ্য প্রান্তে, নন্দনের কোন্ মন্দার-গন্ধ-বন্দিত আনন্দ-কল্লোলিত মন্দাকিনী কূলে, কত কালের দুঃসহ বিরহ অন্তে মিলনের মধুময় সুস্নিগ্ধ আলোকলেখা ফুটিয়া উঠিবে, এবং তাহার কোমল আভায় দেবদম্পতির ন্যায় প্রভান্বিত এই নরদম্পতি আপনাদের অলৌকিক প্রভাতী সঙ্গীতের প্রথম তানে, নবজীবনের মিলন গীতির সুললিত ঝঙ্কারে, সুরকাননে বিমল ঊষার বিকাশকাহিনী প্রকাশ করিবে, তাহা কবিকল্পনার অতীত।

৪

চারুর দুঃখের সীমা নাই। আহারের কষ্টকে সে কষ্ট

বলিয়া মনে করিত না, আমোদ আহ্লাদেরও সে প্রত্যাশিনী ছিল না, সে যাহাকে প্রাণাধিক ভাল বাসিত, সে ত তাহাকে একাকিনী ফেলিয়া তাহার সকল সুখ ও আনন্দ, তাহার হাতের লোহা, সিঁথির সিঁদুর, তাহার সোনার কঙ্কণ, সাধের কণ্ঠমালা সকলই সঙ্গে লইয়া চলিয়া গিয়াছে, সে শুধু এখন মরিয়া বাঁচিয়া আছে মাত্র। যেন সে তাহার মৃত স্বামীর শোকাশ্রুসিক্ত সজীব সমাধী। তাহার প্রশান্ত প্রসন্ন নির্ম্মল হাসি অপসৃত হইয়াছে, তাহার সে আদর অভিমান কিছু নাই, শাখাভ্রষ্ট ধূলিম্লান সৌরভ গৌরব বিচ্যুত ক্ষুদ্র যূথিকা পুষ্পের ন্যায়, সজল জলদাবৃত নিষ্প্রভ চন্দ্রিকা তুল্য, ধূমপরিবৃত সুপবিত্র হোমানল সম এই ধৈর্য্যময়ী সহিষ্ণুতারূপিণী বিকারবিহীনা আশাস্তমিতা বিধবার জীবন ও ঐ ক্ষুধিত আকাঙ্ক্ষাতাড়িত স্বার্থের কঠোর সংসার এই উভয়ের মধ্যে একটা ছায়াময়, রহস্যময় লঘু আবরণ কি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছে। তাহার সকলই ফুরাইয়াছে, এখন তাহার

"মরিতে ঝরিতে শুধু বাকি।"

সকল কষ্ট সহ্য হয়, কিন্তু বিধবার পক্ষে কথার খোঁটা বড় মর্ম্মান্তিক। স্বামীবিয়োগের পর হইতে চারু তাহার শাশুড়ীর দুই চক্ষের বিষ হইয়াছে, যেন চারুর সহিত বিবাহ হওয়াই অনীলের মৃত্যুর কারণ। যতদিন অনীল বাঁচিয়াছিল, অনীলের মা মনে করিতেন, বৌটা আমার ছেলেকে পর করিবে, চারুর বাপ তেমন অবস্থাপন্ন লোক নহেন, আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি অর্থের অনাটনবশতঃ সর্ব্বদা তাহার প্রিয়তমা কন্যাটির তত্ত্ব তল্লাস লইতে পারিতেন না, কিন্তু এই অক্ষমতা-জনিত ত্রুটীকে চারুর শাশুড়ী স্বেচ্ছাকৃত উপেক্ষা বলিয়া মনে করিতেন, তাই

বেয়াই ও বেয়াইনের উপর তাঁহার যত আক্রোশ সমস্ত তিনি তাঁহাদের এই নিরপরাধিনী নিরীহ কন্যাটির অসহায় মস্তকের উপর মুষলধারে বর্ষণ করিতেন। চারু বড় শান্ত মেয়ে, সহস্র অত্যাচার সহ্য করিয়া সে একটিও প্রতিবাদ করিত না, ইহাতে গৃহিণীর কোপ আরও বর্দ্ধিত হইত, কারণ চারুর এই নিশ্চেষ্ট আত্মত্যাগ তাঁহার চক্ষে অবজ্ঞাপূর্ণ ধৃষ্টতা ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়াই প্রতিভাত হইত না। "বোবার শত্রু নাই" এই সর্ব্বজনবিদিত প্রবাদটিকে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

অনীলের মৃত্যুর পর চারুর শাশুড়ী প্রায়ই বলিতেন, "ও তো বৌ নয়, রাক্ষসী, আমার ছেলেটিকে মারবার জন্যেই এসেছিল, তখনই কর্ত্তাকে বলেছিলাম, আচার্য্যি ঠাকুর গুণে বলেছেন, এ মেয়ের রাক্ষসগণ, বিয়ে দিলে মঙ্গল হবে না, তা উনি বল্লেন আহা খাসা চাঁদপানা মুখ, অমন মুখে নুড়োর আগুন জ্বেলে দিতে হয়।"

এই প্রকার হৃদয়-বিদারক কঠিন মন্তব্যগুলা অনীলের মা যে সকল সময় বিশেষ সাবধান হইয়া এবং চারুর অসাক্ষাতে করিতেন তাহা নহে, বিধবা পুত্রবধূর হৃদয়-বেদনার যে কিছুমাত্র তোয়াক্কা রাখা দরকার, তাহা কোন দিন তাঁহার মনে হয় নাই; চারু মধ্যে মধ্যে শাশুড়ীর রসনেন্দ্রিয় সমুৎসারিত এই সকল অকারণপ্রযুক্ত কঠোর কথা শুনিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নির্জ্জন ঘরে বসিয়া একাকী কাঁদিত; কিন্তু হতভাগিনীর তাতেও নিস্তার নাই, তাহার ছোট ননদ রঙ্গিনী, এই উপাদেয় সত্যটি সংগ্রহপূর্ব্বক মায়ের কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিত, "মা, মা, সকলেই বলে, বৌ বড় ভাল, তুমি কি না কি কথা বলেছ তাই শুনে বৌ নাকের জলে চোখের জলে এক

করেছে।”—তা করুক গে, আমিত আর লুকিয়ে বলিনি, ভয় করেও বলিনি, ‘নচ্ছার হাবাতে বেটী, এমনি ক’রে চোখের জল ফেলে ফেলে আমার সংসারে আবার কি একটা অমঙ্গল ডেকে আন্‌বে; চোখের জল ফেল্‌তে হয়, রাস্তায় গিয়ে ফেলুক না সম্বন্ধ ত ঘুচে গিয়েছে।”

চারুর পিত্রালয় হইতে বিষ্ণুপুর মোটে তিন ক্রোশ; চারুর কষ্টের কথা তাহার মায়ের কাছে গোপন রহিল না। তাহার মা লিখিলেন, “মা চারু, তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া আমি চোখে জল রাখিতে পারিতেছি না, আমার ইচ্ছা দিনকতক তোমাকে এখানে আনাইয়া একটু যত্ন করি। কত পাপই যে করেছিলাম, আমার দুধের মেয়ের এত যাতনার কথাও আমাকে শুনিতে হইতেছে!”—চারু অনেক ভাবিয়া লিখিল, “মা, আমার কষ্টের জন্য তুমি দুঃখিত হইও না, আমি কষ্ট সহিতে শিখিতেছি; আমার শ্বশুর শাশুড়ী এখন আমাকে তোমাদের কাছে পাঠাইবেন না, তাঁহাদের অমতে যাওয়া উচিত নয়। এ কঠিন প্রাণ শীঘ্র বাহির হইবে না, সময়ান্তরে আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিব, তুমি ছাড়া তোমার এ দুঃখিনী কন্যার কে আছে মা?”

চারু গোপনে পত্রখানি মায়ের কাছে পাঠাইয়াছিল, কিন্তু সে পত্রের কথা কাহারো জানিতে বাকি থাকিল না। চারুর মা চারুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পড়িয়া সে বালিশের নীচে গুঁজিয়া রাখিয়াছিল, কোন সুযোগে চারুর ছোট জা বিনোদিনী সে খানি লইয়া শাশুড়ীর হাতে দিল!—বিনোদিনী খুব সেয়ানা মেয়ে, এই তার মোটে তের বৎসর বয়স,—এরই মধ্যে বুদ্ধিবলে শাশুড়ীকে করতলগত করিয়াছে, শাশুড়ী বলেন, “আমার ছোট

বৌমার মত সুবুদ্ধি মেয়ে এ কলিকালে আর দুটি দেখা যায় না।”

চারুর মার চিঠি দেখিয়া চারুর শাশুড়ী তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন; মুখে যা আসিল তাহাই বলিয়া গালি দিলেন, অবশেষে বলিলেন, “যদি তুই ফের আমাদের “কুচ্ছো” ক'রে বাপের বাড়ী পত্র লিখ্‌বি তো ঝাঁটা মেরে তোকে অন্দরের বা'র করে দেব। হারামজাদীর পেটে পেটে নষ্টামী!”—চারু আত্মদোষ স্খালনের কোন চেষ্টা করিল না, শুধু অবনত মস্তকে নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল। হায়! হতভাগিনীর এ অশ্রু-উৎস কি রুদ্ধ হইবার নহে?

৫

শ্রাবণ মাসের একদিন দুপুর বেলা চারু একাকিনী নিজের নির্জ্জন ঘরটিতে বসিয়া বাতায়ন অন্তরালে আকাশের দিকে চাহিয়া আপনার অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছে। মেঘাবৃত আকাশের মত তাঁহার হৃদয়াকাশও বিষাদঘন সমাচ্ছন্ন; কিন্তু আজ মেঘান্তরাল হইতে মধ্যে মধ্যে যেমন এক এক বার সৌরকররাশি দীপ্ত-দিবাকরের সকরুণ উদার হাস্যের মত সিক্ত-ধরণীর যৌবন-শ্রী বিকশিত নিটোল শ্যামাঙ্গে আপনার আলোক তুলিকা বুলাইয়া আবার দিগন্তে মেঘান্তরালে অন্তর্হিত হইতেছে, তেমনি চারুর মনে আজ এই বর্ষণার্দ্র বর্ষার স্তব্ধমধ্যাহ্নে তাহার অশ্রু জবারমত নয়নপল্লবে অতীত মধুর স্মৃতির সুধালোকরশ্মি এক এক বার ফুটিয়া উঠিয়া আবার তখনি টুটিয়া যাইতেছে; তাহাতে কি সুখ, কি বেদনা তাহা অন্যে বুঝিতে পারিবে না। অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া আজ কতদিন পরে চারু তাহার হাত বাক্সটি খুলিয়া তাহার স্বামীর ডাইরী খানির প্রত্যেক পৃষ্ঠা সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে নিবিষ্টমনে পাঠ করিতে লাগিল; পড়িতে

পড়িতে স্বামীর প্রতি প্রীতিভরা সুগভীর বিশ্বাসে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, সে সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছিল, কতদিন পূর্ব্বে অনীলের মকরন্দলোলুপ মনোভৃঙ্গ আপনার অনন্ত অতৃপ্ত মুখর কল্পনাজালে তাহার গন্ধমাদর-মোদিত হৃদয়ারবিন্দ পরিবেষ্টনপূর্ব্বক প্রবাস হইতে যে নিত্য-নিয়মিত মধুর গুঞ্জন ধ্বনিত করিয়া এই ডাইরীর প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তাহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহা তাহারই কথা, তাহারই কবিতা! তাহারই স্নিগ্ধ প্রেমের প্রতি গভীর বিশ্বাসের অমরবার্ত্তা এই ডাইরির প্রতি ছত্রে তাহার প্রেমপূর্ণ সরল হৃদয়ের উজ্জ্বল ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে! সকলই আছে কেবল অনীল নাই। সেই হাসি, সেই মুখ, সেই প্রণয়-প্রগল্‌ভ ধীর বচন, সেই প্রেমাদরপরিপ্লুত অমৃতনিষ্যন্দিনী ভাষা, সেই কোমল মধুর, ভাবময়, হাস্যময়, করুণাময়, অর্দ্ধ প্রস্ফুট, অর্দ্ধ মুকুলিত প্রতিভা সমুজ্জ্বল ইন্দিবর বিনিন্দিত প্রফুল্ল আঁখিদ্বয় সমস্তই অম্লান চিত্রের ন্যায় তাহার নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছে! কেবল অনীল নাই!

৬

বাক্সে অনেক জিনিষ ছিল, তন্মধ্যে এক বোতল গোলাপগন্ধ কুন্তলীন আর একশিশি এসেন্স দেলখোস। অনীল লিখিয়াছিল, সে পূজার ছুটীতে বাড়ী গিয়া এই কুন্তলীন ও এসেন্সে চারুকে চর্চ্চিত করিয়া তৃপ্তনয়নে একবার তাহাকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিবে; অনীলের বিশ্বাস ছিল, তাহা হইলে চারুর সর্ব্বাঙ্গে সেই সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবে, যে সৌন্দর্য্যে বিমুক্তকুন্তলা, আসনগ্রভূষণা, শুভ্র-বেশিনী বিশ্ব-বিমোহিনী রমা সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে মৃণালকরে মৃত্যুঞ্জয়ী সুধা এবং মণিরত্ন বহনপূর্ব্বক জ্যোতির্ম্ময়ী নির্ম্মল ঊষার সীমন্তমূলে অচঞ্চল শুক্রের ন্যায়,

তিমিরাবৃত রসাতল গর্ভ হইতে মন্দরমন্থিত ঘূর্ণমান অনন্ত নীলাম্বুরাশির ঊর্দ্ধে উত্থান করিয়া বিকশিত শতদলের উপর আপনার অলক্তরঞ্জিত কমলগঞ্জিত সুকোমল যুগল চরণ সংস্থাপন করিয়া সিক্তবেশে মুক্তকেশে সুমধুর প্রসন্ন দৃষ্টিতে নারায়ণের চিত্তবিভ্রম উৎপন্ন করিয়াছিলেন! মানুষের এত স্পর্দ্ধাতে দেবতার বুঝি অভিশাপ লাগিয়াছে, তাই অনীলের এই কামনা পরিপূর্ণ হয় নাই; কিন্তু সুন্দর শিশি দুটি তাহাব অপূর্ণ বাসনাব সুবাসস্মৃতি-মণ্ডিত হইয়া সুস্নিগ্ধ ঢলঢল স্নেহে পবিপূর্ণ বক্ষে একটা অনাগত বাঞ্ছনীয় বাসরের জন্য বিধুকরবিধৌত কোন মধুযামিনীর সমাগম প্রতীক্ষায় তাহাব বাক্সের মধ্যে অবস্থান করিতেছিল!—চারু একবার শিশি দুটি বাহির করিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া চাহিয়া অতৃপ্তমনে তাহা বাক্সে পুনঃ স্থাপিত করিবে, এমন সময় রঙ্গিনী কোথা হইতে আসিয়া বলিল. "বৌ, ও কিসের শিশি?" চারু ব্যগ্রভাবে শিশি দুটি তাড়াতাড়ি বাক্সে পুরিয়া ভয়চকিতা হরিণীর ন্যায় তাহার চঞ্চল নলিন নয়ন রঙ্গিনীর মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, "ও কিছু নয়।"

রঙ্গিনী মুহূর্ত্তকাল সেখানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তাহার পর ছুটিয়া মায়ের কাছে গিয়া বলিল, "মা বৌর বাক্সে, আতর গোলাপের কেমন ভাল ভাল শিশি, আমাকে দেখে লুকিয়ে রেখেছে, আমি একটা শিশি নিব।"

তখন চারুর শাশুড়ী চারুর সম্মুখে আসিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন. "বৌ, আতর গোলাপে আর তোমার দরকার কি? রঙ্গিনী আমাকে ধরেছে, ছেলে মানুষ ওকে, একটা একটা শিশি দেও।"

চারু শশঙ্কচিত্তে বলিল. "আমার কাছে ত আতর গোলাপ কিছু নেই।"

শাশুড়ী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "নেই, আমার আছে মিথ্যা কথা! কপাল পুড়েছে এখনো লুকিয়ে লুকিয়ে আতর গোলাপ মাখিবার সখ! লজ্জা করেনা? হারামজাদী, পোড়ারমুখী, আর কোথাও কি মিথ্যা কথা বল্‌বার যায়গা ছিল না—দেখি বাক্স?"

চারুর শাশুড়ী চাবী লইয়া জোর করিয়া বাক্স খুলিতেই চারু কুন্তলীন ও দেলখোস দুটী ক্ষিপ্রহস্তে বাক্সের ভিতর হইতে বাহির করিয়া লইল। এবং তাহার নিজের বস্ত্রান্তরালে কাতরকম্পিত বক্ষের উপর দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। গৃহিণীর বিকট চীৎকারে তখন সেই গৃহদ্বারে পরিবারস্থ রমণীমণ্ডলীর সমাগম হইয়াছিল; এবং পড়ার দুই চারি জন রঙ্গপ্রিয়া কুলবধূও এই অসাধারণ কৌতুকদৃশ্য সন্দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সেই লজ্জাহীনা, নির্বুদ্ধি লুব্ধা বিধবার এই প্রকার ঘৃণিত আচরণ দেখিয়া সকলেই প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া চিবুকে তর্জ্জনী স্পর্শপূর্ব্বক ভাবিতে লাগিল, "কি সর্ব্বনাশ, এ যে ঘোর কলি!"—অবশেষে বিস্ময়ের আবেগ কিছু প্রশমিত হইলে তাহারা একবাক্যে চারুকে ধিক্কার দিতে লাগিল; কিন্তু অনীলের পরিত্যক্ত পবিত্র স্নেহস্মৃতি সুরভিমণ্ডিত তাহার প্রিয়তম সুনির্ম্মল পুষ্পসার ও সুগন্ধি তৈলপরিপূর্ণ স্ফটিক-পাত্র দুটি সেই অবগুণ্ঠিতা, ভূম্যবলুণ্ঠিতা, অপমানকণ্টকিতা, কুণ্ঠিতা অনাথা বিধবার অসহায় হৃদয়খানিকে সমগ্র পরিবারের তীব্র তিরস্কার তাড়না ও কঠোর ব্যাঙ্গোক্তি হইতে অক্ষয় কবচের ন্যায় সুরক্ষিত করিয়া, আত্মজীবনের প্রতি সুদুঃসহ ঘৃণা হইতে তাহাকে আজীবন অব্যাহত রাখিল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।
বোয়ালিয়া, রাজসাহী।

চতুর্থ বৎসরের প্রথম পুরস্কার।

অদ্ভুত-হত্যা।

১

কৃত্রিম-মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমাকে ময়মনসিংহ অঞ্চলে যাইতে হইয়াছিল। প্রায় সপ্তাহ কাল তথায় থাকিয়া সে মোকদ্দমার যথাসম্ভব প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া গোয়ালন্দ-ট্রেণে রাত্রে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করি। পরদিন প্রাতঃকালে কাগজ পত্র গুছাইয়া রিপোর্টাদি লিখিয়া নিজের কোন প্রয়োজন বশতঃ জনৈক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে এক জন কনেষ্টবল যথারীতি লম্বা সেলাম ঠুকিয়া, একখানা সরকারী চিঠি আমার হস্তে প্রদান করিল। চিঠির উপরে লাল কালিতে বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লিখিত "অতি দরকারী"—এ দুটী কথা সর্ব্ব-প্রথমে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কনেষ্টবলকে বিশ্রাম ঘর দেখাইয়া দিয়া, ত্রস্ত হস্তে চিঠি খুলিয়া পত্র পড়িতে লাগিলাম। পত্রে প্রধান কর্ম্মচারী যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই ;—

"আজ চারি দিবস গত হইল, মির্জাপুর ষ্ট্রীটের একটা ছাত্রাবাসে মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটী ছাত্র অতি আশ্চর্য্যরূপে হত হইয়াছে। পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত খুনের কিনারা করিতে পারে নাই। তুমি

মুহূর্ত্তমাত্র গৌণ না করিয়া উক্ত হত্যা ব্যাপারের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে। মুচিপাড়া থানার পুলিশ-কর্ম্মচারী হত্যা ব্যাপারের প্রথম অনুসন্ধান করিয়াছে।”

পত্রখানি পাঠ করিয়া আমার বন্ধুদর্শনবাসনা পলকে বিলুপ্ত হইল। সেই কৃত্রিম মদার জটিল মোকদ্দমার গুরুভার হইতে মুক্ত হইতে না হইতে আবার এক হত্যা কাণ্ডের গুরুতর ভার মস্তকে বহন করিতে হইবে ভাবিয়া মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর আদেশ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে, সুতরাং আর ইতস্ততঃ না করিয়া কনেষ্টবলকে বিদায় দিয়া গাড়োয়ানকে গাড়ী প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলাম এবং কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে ত্বরিতাশ্বে মুচিপাড়া থানায় উপস্থিত হইলাম। সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে বড় সাহেবের লিখিত পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাত করাইলে তিনি আমাকে উক্ত হত্যাব্যাপারের প্রধান অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারীর নাম সুশীল বাবু, সুশীল বাবু আমার পূর্ব্বপরিচিত। তিনি আমাকে হত্যা সম্বন্ধে নিজ তদন্তে যতদূর কথা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা একে একে সন্তুষ্টির সহিত সমস্ত বর্ণনা করিলেন। হত্যাসংক্রান্ত আমূল বিবরণ শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম এ ব্যাপারের কিনারা করা বড় সহজ-সাধ্য নহে। পুলিশানুসন্ধানে এ সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল—

“মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী বিক্রমপুর অঞ্চলের বজ্রযোগিনী গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম ৺হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। মহেশ কলিকাতা সিটি কালেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। মির্জ্জাপুরের এক

ষ্টুডেণ্ট মেসে ইঁহার বাসা ছিল। ৺শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার বন্ধে সেই মেসের অধিকাংশ ছাত্রই বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল, কেবল তিন জন বি, এ, পরীক্ষার্থীর সহিত মহেশচন্দ্র বন্ধের সময়ও সেই মেসেই ছিলেন। মেসের দালানটী দ্বিতল, উপরে চারিটী ঘর, নীচে দুটী। মেসে অধিক ছাত্র না থাকায়, পড়া শুনার সুবিধার নিমিত্ত চারিটী ঘরে চারি জন ছাত্র শুইবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। নীচের একটী ঘরে রান্না; এবং অপরটীতে খাওয়া-দাওয়ার কার্য্য সম্পন্ন হইত। মেসে এক্ষণে একটী মাত্র ব্রাহ্মণ দ্বারাই সর্ব্ব কার্য্য চালিত হয়। ব্রাহ্মণটী রাত্রে মেসে থাকে না। ২৬শে আশ্বিন রাত্রিতে, মহেশচন্দ্রকে অন্যান্য রাত্রির ন্যায় সকলে সুস্থ শরীরে আপন ঘরে শুইতে দেখিয়াছেন। পর দিবস প্রাতঃকালে অতুল বাবু নামে ঐ মেসেরই অন্যতম ছাত্র যখন মহেশচন্দ্রের ঘরের মধ্য দিয়া নিম্নতলে যাইতে ছিলেন, তখন তাহাকে ছিন্ন-কণ্ঠ, রক্তাক্ত কলেবর দেখিতে পাইয়া উচ্চ চীৎকারে সকলকে সেখানে একত্র করেন। পরে, তথায় উপস্থিত সকলের পরামর্শ মত অগৌণে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া সে ঘরে একখানা রক্ত রঞ্জিত বড় কাটারী ও একপাটি নাগরা জুতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ গুলি ইতিপূর্ব্বে মেসের কেহ কখন দেখে নাই। হত্যাকারীর এপর্য্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, হত্যাগৃহের একটী সামান্য জিনিস কিম্বা একটী কপর্দ্দকও স্থানান্তর হয় নাই। মহেশের চাবি তাহার পকেটে পাওয়া গিয়াছে, উক্ত চাবি দ্বারা পুলিশ মহেশের পোর্টমেণ্টও হাত বাক্স খুলিয়া টাকা পয়সা মহেশের লিখিত হিসাবের মিল মতনই পাইয়াছেন।

"মহেশের সহিত যে সে মেসে কাহারও মনোমালিন্য না

বিবাদ ছিল, এমনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনটী ছাত্র ও ব্রাহ্মণের 'জবানবন্দী'তে হত্যার অনুসন্ধানে কার্য্যকরী হইতে পারে, এরূপ কোন কথাই প্রকাশ পায় না। ইঁহাদের কেহ কাহাকে মহেশের হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করেন না। পরন্তু মহেশের সহিত সকলেরই সদ্ভাব ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।"

পুলিশের এই রিপোর্ট দেখিয়া এবং ব্রাহ্মণ ও ছাত্রত্রয়ের জবানবন্দী আনুপূর্ব্বিক মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া অনুসন্ধানের কোন সূত্রই বাহির করিতে পারিলাম না। তবে জুতা ও কাটারীখানা দেখিতে হইল। সুশীল বাবু তৎক্ষণাৎ সেগুলি আমার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। আমি তখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলাম, রক্তাক্ত কাটারিখানা অপূর্ব্বব্যবহৃত। জুতাখানিও একেবারে অব্যবহৃত বলিয়াই বোধ হইল। উহা পায়ে দেওয়ার কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হইল না। সুতরাং এ গুলি অনুসন্ধানের পক্ষে কোন সহায়তা করিবে, এরূপ মনে করিতে পারিলাম না। আমি সেখানে আর বেশী সময় অপেক্ষা না করিয়া সেই মেসটী দেখিতে মনস্থ করিলাম এবং সুশীল বাবুর সহিত সেই মেসে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

তখন পূজোপলক্ষে স্কুল কলেজাদি বন্ধ ছিল, সুতরাং সকলকেই বাসায় প্রাপ্ত হওয়া গেল। আমি প্রথমে হত্যাগৃহ এবং তৎপরে মেসের অন্যান্য স্থান যথারীতি পরীক্ষা করিলাম; কিন্তু হত্যা সম্বন্ধে কোন নূতন তথ্যই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলাম না। পরিশেষে আমি হত্যাগৃহে প্রথম উপস্থিত সেই অতুল বাবুকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিলাম, এবং উত্তর আমার নোট-বহিতে লিখিয়া লইলাম।

আমি। আপনি সে দিন প্রাতেই প্রথম সে কক্ষে

পদার্পণ করিয়াছিলেন, না, রাত্রে সে কক্ষের ভিতর দিয়া আর কোন বার নীচে নামিয়া ছিলেন ?

অতুল বাবু। না, সেই প্রথম আমি সে কক্ষে প্রবেশ করি।

আমি। যে রাত্রে মহেশ খুন হয়, সে রাত্রে সর্ব্বশেষ তাহাকে কে জীবিত দেখিয়াছিলেন ?

অ, বাবু। সর্ব্বশেষ কে জীবিত দেখিয়াছিলাম, মনে নাই। আমরা সকলেই একসঙ্গে নীচের ঘর হইতে উপরে আসিয়া আপন আপন কক্ষে পড়িতে বসিয়াছিলাম।

আমি। আপনারা সেদিন শয়ন করিবার পূর্ব্বে আর নীচে যান নাই ?

অ, বাবু। আমি সেদিন আর নীচে যাই নাই।

আমি তখন আর দুজনকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা উত্তরে বলিলেন ; সে রাত্রে তাঁহাদের কাহারও নীচে যাইবার প্রয়োজন হয় নাই। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম।—

"আপনাদের মেসের ছাত্রগণ ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত মহেশ বাবুর বিশেষ জানাশুনা ছিল বলিয়া আপনারা জানেন ?

অ, বাবু। মহেশ বাবুর বিশেষ বন্ধু ত কেহ দেখিতে পাই না।

আমি। মহেশ বাবুর কাহারও সহিত শত্রুতা বা মনোবিবাদ ছিল, বলিতে পারেন ?

অ, বাবু। না, মহাশয়, তাঁহার সহিত কাহারও শত্রুতার কথা আমরা পরিজ্ঞাত নহি।

আমি। হত্যার দিনে মহেশ বাবু সমস্ত দিবস কি মেসেই ছিলেন, না কোথাও বাহির হইয়াছিলেন ?

অ, বাবু। (খানিক চিন্তার পর) হাঁ, মহেশ বাবু সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে বাহিরে গিয়াছিলেন।

আমি। কোথায় গিয়াছিলেন, বলিতে পারেন?

অ, বাবু। না, তাহা বলিতে পারি না।

আমি। মহেশ বাবুর কি বেড়াইবার অভ্যাস ছিল?

অ, বাবু। মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে যাইতেন বৈ কি!

আমি। হত্যার তারিখে কোন সময়ে বাসায় প্রত্যাবর্তন করেন?

অ, বাবু। বোধ হয় রাত্রি ৭।।টা, কি ৮টার সময়।

আমি। মহেশ বাবুর স্বভাব চরিত্র কেমন ছিল, আপনার বিশ্বাস।

অ, বাবু। (একটু বিরক্তির সহিত) ও গুলি কি বলিব?

আমি তখন অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলাম, "দেখুন, আপনারা সকলেই বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান। অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন, এ হত্যার কিনারা করা বড় সহজ সাধ্য নহে। কেহ অর্থলোভে এ নৃশংস কাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছে, অবস্থাপর্য্যবেক্ষণে, এমন বিশ্বাস আমি করিতে পারিতেছি না। ঈর্ষামূলেই বোধহয় এ লোমহর্ষণ হত্যা সংশাধিত হইয়াছে। এক্ষণে যদি আমি হত ব্যক্তির সম্বন্ধে সমস্ত কথা অবগত হইতে না পারি, তবে প্রকৃত দোষীর অনুসন্ধান কিরূপে করিতে সমর্থ হইব? আর অবশ্য ইহাও আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, যদি কোন প্রকারেই এ হত্যার কূল-কিনারা করা না যায়, তবে পুলিশ শেষ কালে আপনাদের লইয়াই টানাহিঁচড়া করিতে পারে। কে জানে, আপনাদের কেহ এ ব্যাপার-বিজড়িত নহেন? এ বাড়ীতে অপর কেহ বাস করে না, মহেশ বাবুর সহিত অন্য কাহারও

শত্রুতা ছিল না একথা আপনারাই বলিতেছেন ; এমতাবস্থায় কাহার উপর প্রথম সন্দেহদৃষ্টি পড়িতে পারে, তাহা আপনারাই ভাবিয়া দেখুন। হত্যাগৃহে প্রাপ্ত কাটারিখানি সম্পূর্ণ নূতন, সুতরাং হত্যাকারী যে পুরাতন-পাপী নহে, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে—একপাটী নাগরাজুতা পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কে বলিতে পারে ইহা আপনাদের চালাকি নয় ?—

আমি এতদূর বলিলে ছাত্র বাবুটী অপেক্ষাকৃত কাতরস্বরে বলিলেন, "ক্ষমা করুন মহাশয়, আমি যাহা জানি, বলিতেছি। আমার বিশ্বাস মহেশবাবু নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ছিলেন না।

আমি। কাহার সঙ্গে, কোথায়, মহেশ বাবুর আসা যাওয়া ছিল, বলিতে পারেন ?

অ, বাবু। সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। তবে তিনি মধ্যে মধ্যে অনেক রাত্রির পর বাসায় আসিতেন এবং মাঝে মাঝে একটা ঝি শ্রেণীর স্ত্রীলোক তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিত।

আমি। ঝির ঠিকানা আপনি জানেন ?

অ, বাবু। না, মহাশয়, ঠিকানা জানি না।

আমি। ঝিকে দেখিলে চিনিতে পারিবেন ?

অ, বাবু। হাঁ, পারিব বৈ কি! হত্যার তারিখেও দিনের বেলায় ঝি তাঁহার নিকট আসিয়াছিল।

আমি। যে দিন হত্যার কথা জানিতে পান, সে দিন প্রথমে কে সদর দরজা খুলিয়াছিলেন ?

অ, বাবু। সম্ভবতঃ সদর দরজা খোলা ছিল।

আমি। সদর দরজার খিলান ত অভগ্ন : তবে হত্যা কিরূপে সংঘটিত হইল, আপনাদের বিশ্বাস ?

অ. বাবু। সদর দরজা মধ্যে মধ্যে খোলাও থাকে। বোধ হয় সে রাত্রে আমরা কেহ দরজা ভেজাই নাই। বামনটী চলিয়া গেলে, কোন দিন দরজা ভেজান যায়, কোন দিন বা যায় না।

আমি। বামনটী কেমন, কতদিন যাবৎ এখানে কাজ করিতেছে?

অ. বাবু। অনেক দিন। বামনটী খুব বিশ্বাসী. সে আমাদের বড় যত্ন করে।

আমি এপর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া সুশীল বাবুর সহিত মেস হইতে বহির্গত হইলাম। তখন বেলা ১টা বাজিয়া গিয়াছে। সুতরাং আর থানায় না যাইয়া, সুশীল বাবুকে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া, বরাবর বাসাভিমুখে অগ্রসর হইতে গাড়োয়ানকে আদেশ করিলাম।

২

আমি অনুসন্ধানের সূত্র উদ্ভাবনার্থ যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম, প্রথমে ততই নিরাশা-সাগরে নিমগ্ন হইতে আরম্ভ করিলাম। আমি বুঝিয়া উঠিলাম না, এ হত্যা কাহার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। ধনাপহরণ মানসে কি এ হত্যা সংঘটিত হওয়া সম্ভব? তাহা হইলে একগাছি তৃণেরও বিপর্য্যয় ঘটিল না কেন? শুনিয়াছি, মহেশের চরিত্র ভাল ছিল না, তবে কি অপর কোন মন্দ-চরিত্র প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে? অসম্ভব কি? কিন্তু সে ব্যক্তির অনুসন্ধান কিরূপে করিব? মেসের কেহ ত কুচরিত্র নহে? সদর দরজার খিলান অভগ্ন: এমতাবস্থায় সহজে বাহিরের লোক কিরূপে ভিতরে প্রবেশ করিবে? কিন্তু যদি সদর দরজা সে রাত্রে খোলাই থাকিয়া থাকে, তবে এই এক কথার উপর নির্ভর করিয়া মেসস্থ ছাত্রদিগকে দোষী সাব্যস্থ

করা ত যুক্তিযুক্ত নহে। আচ্ছা, একটা লোক একই বাড়ীতে খুন হইল, আর বাড়ীর অপর কেহই ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না, ইহা বা কি প্রকারের কথা? হত্যাগৃহে একখানা নাগরা জুতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তবে কি হত্যাকারী কোন হিন্দুস্থানী? কিন্তু তাহা হইলে জুতাখানি একেবারে অব্যবহৃত থাকিবার কারণ কি? এ জুতা পায়ে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ত কিছুতেই বোধ হয় না।

মেসের ছাত্র হইতে জানিলাম, একটী ঝি মহেশের কাছে আসা যাওয়া করিত, হত্যার তারিখেও আসিয়াছিল; সে ঝি কে? তাহার সন্ধানের উপায় কি?—এবম্বিধ নানা প্রশ্ন ক্রমে ক্রমে মনে উদিত ও লয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শেষে যখন আর ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলাম না; কোন্ সূত্রাবলম্বনে অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ করিব, তাহার কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না; তখন অগত্যা তখনকার মত এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, আজ রজনীযোগে গুপ্তভাবে মির্জ্জাপুরের সেই ছাত্রাবাসে ছাত্রদিগের কথাবার্ত্তা শুনিতে চেষ্টা পাইব। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা হত্যা-ব্যাপারে সংসৃষ্ট থাকে কিম্বা এ সম্বন্ধে কিছু পরিজ্ঞাত থাকে, তবে খুব সম্ভবতঃ ইহাদিগের মধ্যে আজ এ বিষয়ের গোপনীয় কথাবার্ত্তা চলিতে পারে। তখন বোধ হয়, হত্যা সম্বন্ধে কিছু না কিছু সন্ধান পাইতে পারিব।

এইরূপ স্থির করিয়া স্নানাহার সমাপনান্তে শয্যায় পড়িয়া একটু বিশ্রাম ভোগ করিতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ মনে পড়িল, এ হত্যাসম্বন্ধে ডাক্তার সাহেব কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমি এপর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এ তথ্যটী

জানিয়া লওয়া আমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য ;— এই মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক 'দড়া চূড়া' পরিধান করিয়া পুনরায় মুচিপাড়া থানাভিমুখে রওনা হইলাম।

যথাকালে মুচিপাড়া থানায় পঁহুছিয়া সরকারি ডাক্তারের রিপোর্ট পাঠে যাহা অবগত হইলাম, তাহাতে সন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হইল। ডাক্তার বলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে হত ব্যক্তিকে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে অচেতন করা হইয়াছিল। পরে অজ্ঞানাবস্থায় তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে ইহাকে হত্যা করা হই[illegible] ক ভয়ানক কথা! জীবিতাবস্থায় হত্যা করিলে পাছে আহত ব্যক্তির আর্ত্তনাদে অন্যান্য লোক জাগরিত হইয়া পড়ে, এজন্য পূর্ব্বাহ্ণে সাবধান হইয়া হত্যাকারী ইহার উপর বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল। হত্যাকারী তবে ত নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি নহে! মেসেরই কোন ছাত্র কি তাহা হইলে আন্তরিক বিদ্বেষবশে, গুপ্ত কারণে, অপর সকলের অজ্ঞাতে এরূপ সাবধানতা সহকারে হত্যাকাণ্ড সমাধা করিল? সন্দেহ ক্রমে দৃঢ় হইতে লাগিল। এ সময়ে একবার মহেশের মৃত দেহ দেখিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে সুবিধা ঘটিয়া উঠিল না। আমার কলিকাতা পঁহুছিবার বহু পূর্ব্বেই, ডাক্তারের পরীক্ষার পর উক্ত মৃতদেহের সংকার হইয়া গিয়াছিল।

নানা বিষয়িণী চিন্তার পর অবশেষে আমি প্রথম অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারী সুশীল বাবুর সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিলাম। এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুশীল বাবু, কি সূত্রে অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ করিব?" সুশীল বাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সূত্র বাহির করিবার জন্যই ত টিকটিকির প্রয়োজন।" সুশীল বাবু ডিটেক্টিভ কে টিক্‌টিকি বলিতেন। আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম,

"আপনি সেদিন ঘর তল্লাসের সময় কাহারও কাছে ক্লোরোফর্ম আছে কি না, অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কি?" সুশীল বলিলেন, "না, আমরা ত তখন জানিতাম না যে হত ব্যক্তির উপর প্রথমে ক্লোরোফর্ম প্রযুক্ত হইয়াছিল।" আমি তখন হাসিয়া বলিলাম "অনুসন্ধানের সকল সুযোগ আমি কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং এখন এ অদ্ভুত হত্যা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া কৃত কার্য্যতার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।" ইহার উত্তরে সুশীল বাবু বলিলেন, "ভাল মনে পড়িল; সে দিন মহেশচন্দ্রের হাত বাক্স অনুসন্ধানের সময় ইহার ভিতরের কতকগুলি চিঠি পত্র আমি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম, অবকাশাভাবে সে গুলি এ পর্য্যন্ত পড়ি নাই। আপনার ইচ্ছা হইলে আপনি তাহা পড়িয়া দেখিতে পারেন, যদি কোন সূত্র বাহির হয়।" এই বলিয়া তিনি কতকগুলি বিশৃঙ্খল চিঠিপত্র আনিয়া আমার সম্মুখস্থ টেবিলে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। আমিও তখন আর কিছু করিবার নাই ভাবিয়া সেগুলি হইতে এক এক খানি পত্র লইয়া আগ্রহ সহকারে আপন-মনে পড়িতে লাগিলাম। পাঁচ সাত খানি চিঠির পর একখানি চিঠি পাঠ করিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিলাম। চিঠিখানি অবিকল এই রূপ;—

"—নং হাড়কাটা গলি।
১৬শে আশ্বিন।

প্রাণের মহেশ,

তুমি আর এখন আসিতেছ না কেন? বিধু বাবুর সহিত ঝগড়া করিয়া আমায় পরিত্যাগ করা কি তোমার উচিত? আজ যা হয়, একটা হইয়া যাইবে। বিধু বাবু বাড়াবাড়ি করিলে, তাহাকে আমার কাছে আসিতে

বারণ করিব। আমার কুন্তলীন একবারে ফুরাইয়া গিয়াছে। দেলখোস নামে নাকি এক প্রকার নূতন এসেন্স বাহির হইয়াছে, দেখিতে পাই কি? ঝিকে পাঠাইলাম, তুমি আজ অবশ্য অবশ্য আসিবে, অন্যথা না হয়। ইতি।

তোমারই ভালবাসার

নলি—।”

পত্রখানা দুইবার পড়িয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। পত্রের তারিখ দেখিয়া অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পাইল। এ পত্রে ঝির সন্ধান পাইলাম। বিধু বাবু নামে কোন ব্যক্তির সহিত মহেশের মনোমালিন্য ছিল, পত্র পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম। এক্ষণে যেন অনুসন্ধানের কিছু কিছু সূত্র বাহির হইল, মনে করিলাম। আমি আর বিলম্ব না করিয়া ধড়াচূড়া ছাড়িয়া একটা ফিট্ বাঙ্গালী বাবু সাজিলাম। তাহার পর চিঠিখানা পকেটে পুরিয়া, আমার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত গাড়োয়ানকে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া পদব্রজে রাস্তায় বাহির হইলাম।

৩

হাড়কাটা গলির সেই বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। আমি একেবারে ‘সপাসপ’ উপরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তখন অপরাহ্ন পাঁচটা— সন্ধ্যার প্রাক্কাল। গৃহকর্ত্রী বেশভূষা পরিপাটী করিতেছে। আমি চির-পরিচিতের ন্যায় একখানা কেদারা টানিয়া বসিয়া পড়িলাম। যুবতী তখন আমার অভ্যর্থনার্থ তাড়াতাড়ি আপন কার্য্য সমাধা করিয়া ঝিকে তামাক আনিবার নিমিত্ত আদেশ করিল।

আমি ইত্যবসরে আপন মনে অনুচ্চস্বরে বলিতে লাগিলাম, “বিধু বাবুর এতক্ষণ এখানে আসিবার কথা

ছিল, কই তিনি যে আসিলেন না!” যুবতী উত্তরচ্ছলে বলিল, “কই, সে ত আজ কয়দিন আসিতেছে না। সেই যে সেদিন মহেশের সঙ্গে মারা মা—” এ পর্য্যন্ত বলিয়া যুবতী আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি যেন নিতান্ত অন্য-মনস্কভাবে উত্তর করিলাম, “তা কাজটা কি ভাল হয়েছিল? আমি সমস্তই শুনিতে পাইয়াছি। বিধু আমার পরম বন্ধু।

যুবতী। কই আপনাকে ত একদিনও এখানে দেখি নাই।

আমি। এতদিন আসিবার প্রয়োজন পড়ে নাই; তাই আসি নাই; কিন্তু সেদিনকার ঘটনার পর বিধু প্রতিজ্ঞা করিয়াছে; সে আর কখনও এখানে একাকী আসিবে না।

যুবতী। তা মহাশয়; আমার দোষ কি বলুন? বাস্তবিক; সেদিন মহেশের কাজটা ভারি অন্যায় রকমের হয়েছিল। ভদ্র লোকের গায়ে হাত তোলা, জুতা মারা, এগুলি নেহাত ছোট লোকের কর্ম্ম।

এই বলিয়া যুবতী স্বহস্তে প্রস্তুত পানের খিলি দুটী আমাকে প্রদান করিল। আমি সমস্ত ব্যাপার ইতিমধ্যে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। এক্ষণে আমার মনে হইতে লাগিল, এ জুতোমারা কাণ্ডের প্রতিশোধ লইতে বিধু বাবু নামক ব্যক্তির পক্ষে মানসিক উত্তেজনা-প্রাবল্যে মহেশের জীবনলীলা সাঙ্গ করা একেবারে অসম্ভব নহে। ইহা ২৬শে আশ্বিনেরই ঘটনা। যাহা হউক, অধুনা আমার পক্ষে এই বিধু বাবুর অনুসন্ধান লওয়া বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িল; কিন্তু এখানে আমি বিধু বাবুর বন্ধু বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছি, সুতরাং সোজাসোজি ইহাকে সেকথা জিজ্ঞাসা না করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। ইতিমধ্যে, ঝি-মূর্ত্তি,

একটী রূপার হুকা হাতে করিয়া সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। এবং আমাকে দেখিয়া বলিল,—

"এটী যে নূতন বাবু!" যুবতী তদুত্তরে বলিল "ইনি বিধুভূষণের বিশেষ বন্ধু!"

ঝী। কোন্ বিধুভূষণ?

যুবতী। আঁ্যা—নেকি? মুখুযো বিধু—সেই ২১ নম্বর কলুটোলার।

এতক্ষণে সহজেই আমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে;—আমি ঘটনাক্রমে বিধুর ঠিকানা অবগত হইলাম। সুতরাং আর সেখানে অপেক্ষা করিবার দরকার নাই ভাবিয়া, ঝির কথার উত্তরচ্ছলে অন্যমনস্ক ভাবে বলিলাম "বিধু বাবুর ত এখনই এখানে আসিবার কথা ছিল, দেরী হইতেছে কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। তা, আমি একটু দেখিয়া, আসিতেছি।" এই বলিয়া আমি "২১নং কলুটোলা" ঠিকানাটি মনে রাখিয়া সে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত হইলাম। এবং অবিলম্বে মুচিপাড়া থানায় আসিয়া পঁহুছিলাম।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। আসিয়া আমি দেখি সুশীল বাবু আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া বলিলে, তখনই বিধুর সম্বন্ধে তদন্ত করা উচিত বলিয়া পরামর্শ স্থির হইল। দুই জন পুলিশ কনেষ্টবল, পুলিশ-পোষাক পরিহিত সুশীল বাবু এবং বাঙ্গালী বাবু আমি—শকটারোহণে অগৌণে কলুটোলায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বলিয়া রাখা ভাল, হত্যাগৃহে প্রাপ্ত কাটারি এবং নাগরা জুতা আমাদিগের সঙ্গে লইয়াছিলাম।

তাঁহাদিগকে গাড়িতে পথের উপর অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমি একাকী সেই ২১নং বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম।

এটী একটী ছোটখাট ডিস্পেনসারী। অনুসন্ধানে জানিলাম, সুধীর বাবু নামে জনৈক ভদ্র লোক এ ডিস্পেনসারীর স্বত্বাধিকারী। তিনি সপরিবারে ইহারই উপরতলে বাস করেন, নীচের ঘরে ডাক্তারখানা। আরো জানিলাম, সত্য সত্যই বিধুভূষণ নামে উক্ত সুধীর বাবুর এক ভাইপো এ বাড়িতে বাস করেন। তিনি এক্ষণে বেকার অবস্থায়ই আছেন।

আমি যে সময় সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সে সময় ডাক্তার বাবু বাসায় ছিলেন না। সুতরাং ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডারকে বিধু বাবুকে সংবাদ দিতে বলিয়া নীরবে সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কম্পাউণ্ডার উপরে চলিয়া গেল, এবং অল্প সময়ের মধ্যে আরক্তনয়ন, বিষাদ-বদন, রুক্ষ-কেশ এক যুবক সমভিব্যাহারে সে কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। যুবকের মুখাকৃতি ও ভাবগতি সন্দর্শনে আমার মনের দারুণ সন্দেহ একেবারে বিশ্বাসে পরিণত হইল।

আমি একটু ব্যস্ততার সহিত অথচ মৃদুস্বরে যুবককে বলিলাম, "আমি হাড়কাটা গলি হইতে আসিয়াছি। পথে গাড়ীতে 'নলি' অপেক্ষা করিতেছে, আপনি একটু বাহির হইতে পারেন ?" যুবক সংক্ষেপে উত্তর করিল "আমি আজ বড় অসুস্থ।" আমি তখন ব্যগ্রভাবে বলিলাম, "তবে আপনি একটু এখানেই অপেক্ষা করুন, আমি তাহার নিকট হইতে এই আসিতেছি।" এই বলিয়া ত্বরিতপদে সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম, এবং কয়েক মুহূর্ত্তের পর দলবলসহ সুশীলকে সে বাড়ীতে উপস্থিত হইতে উপদেশ দিয়া, পুনরায় ডাক্তারখানায় প্রবেশ করিলাম। এবারে তাড়াতাড়ি আসিয়াই আমি দৃঢ়মুষ্টিতে বিধুর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া,

বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সেই নাগরা জুতাখানি বাহির করিয়া বলিলাম, "দেখ দেখি বিধু, তুমি এ জুতা সেদিন রাত্রিকালে মহেশের হত্যাগৃহে ফেলিয়া আসিয়াছিলে কি না ?

আমার কথা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া বিধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং স্বীয় হস্ত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা পাইল। তখন আমি আমার মুষ্টি দৃঢ়তর করিয়া বলিলাম, "সে চেষ্টা বৃথা, তুমি মহেশের হত্যাকারী, তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করিলাম।'

ইত্যবসরে কনেষ্টবলসহ সুশীল বাবু সে গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আসামী গ্রেপ্তার হইয়াছে, এক্ষণে থানায় চলুন।'

বিধু এ সকল দেখিয়া শুনিয়া একেবারে দমিয়া গেল। আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলাম, "দেখ, বিধু, আমি সমস্তই জানিতে পারিয়াছি, তুমি হাড়কাটা-গলিতে 'নলির' বাড়ী মহেশ কর্ত্তৃক প্রহৃত ও অবমানিত হইয়া প্রতিশোধ লইবার মানসে, উত্তেজনা বশে, সেদিনই মহেশকে খুন করিয়াছ। এ বিষয়ের সমস্ত প্রমাণাদি আমি সংগ্রহ করিয়াছি, এক্ষণে চল, তোমাকে হাজতে লইয়া যাইব।"

আমি এতটুকু বলিয়া দেখিলাম, বিধু আমার সমস্ত কথা শুনিতেছে কি না সন্দেহ। কারণ, ক্রমে যেন তখন তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল।

তদনন্তর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিধু, তুমি এক্ষণে কি বলিতে বা কি করিতে চাও ?" সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে উত্তর করিল, "মহাশয়, আমার কিছু বলিবার বা করিবার নাই। পাপ গোপনে থাকে না। পাপের ফল অবশ্যই ভুগিতে হইবে, চলুন, আমি কোথায় যাইব।'

আমি বলিলাম, "তুমি হত্যাপরাধ স্বীকার করিতেছ ?" সে উত্তর করিল, "আর মিথ্যা বলিব না ; আমি হত্যা করিয়াছি।"

আমরা সেখানে বসিয়াই উপস্থিত কতিপয় ভদ্রলোক সমক্ষে বিধুর স্বীকারোক্তি এবং তৎকর্ত্তৃক বর্ণিত হত্যার আমূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

অবমানিত হইয়া উত্তেজনা-বশে যে এ ভীষণ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল ; মহেশ যাহাতে চীৎকার করিতে না পারে ; তজ্জন্য যে পূর্ব্বাহ্নেই ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করিয়াছিল ; অনুসন্ধানকারীকে বিপথে চালিত করিবার জন্য যে হত্যাগৃহে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নাগরাজুতা রাখিয়া আসিয়াছিল, একে একে এ সমস্তই বিধু স্বীকাব করিল। এইরূপে বিধুর জবানবন্দী সমাপ্ত হইলে আমরা তাহাকে থানায় লইয়া চলিলাম।

বলা বাহুল্য, এই অদ্ভুত-হত্যার মোকদ্দমা দায়রা সোপর্দ্দ হইল, এবং দায়রায়, জজ সাহেব ও জুরির বিচারে, বিধুভূষণ চিরনির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইল।

শ্রীরজনীচন্দ্র দত্ত।
হেড্মাষ্টার, বেজুড়া স্কুল, (শ্রীহট্ট)।

পঞ্চম বৎসরের প্রথম পুরস্কার।

আমার চাকরী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্কুল ছাড়িয়া চাকরীর জন্য প্রথম দুই বৎসর কত লোকের যে উমেদারী করিয়াছি, বৃথা আশায় মুগ্ধ হইয়া কত লোকের দ্বারে প্রত্যহ কতবার যে যাওয়া আসা করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। সে সময় যেখানে চাকরী খালির একটু আভাস মাত্র জানিতে পারিতাম অমনি 'পেরির' চাক্‌চিক্যময় সলাইন 'ফুলস্কেপ' কাগজে যথাসাধ্য সুন্দররূপে দরখাস্ত লিখিয়া সেই মহাতীর্থ সদৃশ সাহেবমণ্ডিত আফিসমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। বাটী হইতে বাহির হইবার সময় মনে স্বতঃই আশার এই ক্ষীণ শিখাটী জ্বলিয়া উঠিত যে 'এবার লাগ্‌লেও লাগ্‌তে পারে'। কিন্তু হায় প্রত্যাগমনকালে প্রতিবার এক হৃদয়-ভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস সেই ক্ষীণ শিখাটিকে নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়া হৃদয়ের চিরনিবদ্ধ অন্ধকারকে অধিকতর ঘনীভূত করিয়া তুলিত। প্রথম প্রথম বাড়ীর সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্নচিত্তে আমার প্রত্যাগমন অপেক্ষায় থাকিত; এবং বাড়ী ফিরিবার পর যখন তাহারা আমার ক্রন্দনোন্মুখ মুখ হইতে নিষ্ফলতার নিরস কাহিনী শ্রবণ করিত তখন বোধ হয় আমার ন্যায় তাহারাও মর্ম্মের কোন অংশে একটী

ক্ষুদ্র আঘাত অনুভব করিত। তাই সে সময় তাহারা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিত 'হায়, এমনি পোড়া অদৃষ্ট !'

এই রকমে দুই বৎসর চলিয়া গেল। আমিও নিস্ফলতার পেষণে দিন দিন পিষ্ট হইতে লাগিলাম। কিন্তু তবুও চাকরীর আশা ছাড়িতে পারিলাম কই ? পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যহ সংবাদ পত্রের অপেক্ষায় অতি প্রত্যুষে লাইব্রেরীর চিরপরিচিত বেঞ্চে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। তাহার পর কাগজ আসিলে অগ্রে কর্ম্মখালীর বিজ্ঞাপনটী (wanted) আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতাম। সৌভাগ্য বশতঃ যদি কোন উপযুক্ত চাকরী খালীর বিজ্ঞাপন থাকিত তাহা হইলে তীক্ষ্ণধার ছুরির সাহায্যে তৎক্ষণাৎ সেইটিকে হস্তগত করিতাম। একখানি কাগজে উহার অবিকল নকল সংগ্রহ না করিয়া উহাকে স্বস্থানচ্যুত করিবার তাৎপর্য্য, পাছে অন্যে দরখাস্ত করিয়া আমার আশা পথ কণ্টকিত করিয়া তুলে। তখন চাকরী এতই অমূল্য বস্তু হইয়া পড়িয়াছিল।

নিয়মিতরূপে লাইব্রেরী হইতে কর্ম্মখালীর সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ডাক মারফত দরখাস্ত পাঠাইতে লাগিলাম। কেবল যেগুলি বিজ্ঞাপনদাতার ঠিকানা সমেত প্রকাশিত হইত সেই সকল স্থলে নিজে যাইয়াই দেখা করিতাম। এই রকমে আরও কিছু দিন কাটিল। তাহার পর একদিন দুপুর বেলায় ডাক হরকরা আমার নামে একখানি চিঠি দিয়া যায়। তখন আমি দিবানিদ্রায় অভিভূত ছিলাম। কারণ সে সময় আমার 'কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।' ঘুম ভাঙ্গিলে ছোট ভাই চিঠি খানি দিয়া গেল। চিঠির উপরে আমার নাম ও ঠিকানা লিখা ছিল। এবং উহা খুলিবার সময় মোহরের উপর নজর পড়াতে দেখিলাম উহা প্রথমে জেনারেল পোষ্টাফিসে ফেলা

হইয়াছিল। তখন আবার আশাব বাণী হৃদয কর্ণে বাজিয়া উঠিল। কম্পিতহস্তে ত্রস্তভাবে চিঠি খুলিয়া পড়িয়াই আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিলাম। একটি আফিস হইতে সাহেব চিঠি লিখিয়া ডাকিযা পাঠাইযাছিল। অবিলম্বে এ শুভ সংবাদ বাড়ীব সকলে শুনিল। বযস্ক ব্যক্তিবা বলিলেন, "হবে না ত কি। তুই কি লেখা পড়া শিখিস নি?" স্ত্রীলোকেবা বলিলেন 'আহা তাই হোক। এই পূর্ণিমাতে বাবা সত্যনারা'ণেব স-পাঁচ পয়সাব সিন্নি দেবো।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চিঠি খানিতে পবদিবস দশটাব সময সাহেবেব সহিত তাঁহার আফিসে দেখা কবিবাব কথা লিখা ছিল। সুতবাং পবদিবস নযটাব মধ্যেই স্নানাহাব শেষ কবিযা লইতে হইল। তাহাব পব সিন্ধুক হইতে জামা কাপড় বাহিব কবিয়া বেশ ভূষা কবিযা উদ্দেশে দেবতাদেব প্রণাম কবিয়া যখন সিড়ি দিয়া নামিতেছি সেই সময় বতনদাব সঙ্গে সিড়িতে দেখা হইল। বতনদা সম্পর্কে আমাব ঠাকুবদাদা হইতেন।

তিনি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন "কিহে ভাযা, আজ এত সকাল সকাল কোথায়?"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম "আজ্ঞে এই চাকরীব চেষ্টায।"

বতনদা পুনবায় জিজ্ঞাসা কবিলেন "কোথাও জোগাড হোল নাকি?"

আমি। "এক জায়গা থেকে ডেকে পাঠিয়েছে।"

বতনদা। "তা একবাব উপবে চল। বিশেষ দবকার আছে।"

পুনরায় উপরে যাইতে আমি অনেক আপত্তি করিলাম। অধিক কি ইহাও জানাইলাম যে সাহেব দশটার সময় দেখা করিতে লিখিয়াছেন। কিন্তু তখন এ সব আপত্তি শুনে কে? রতনদা আমাকে টানিয়া উপরে লইয়া গেলেন এবং মাকে ডাকিয়া বলিলেন "বৌমা, ছেলেটাকে কি এমনি করে সাজিয়ে দিয়ে সাহেবের কাছে পাঠাতে হয়। এ বেশে সাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে যে তারা দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে। কই চিরুণীখানা দাও?"

মা হাসিতে হাসিতে চিরুণী ও ব্রুষ আনিয়া দিলেন। তখন রতনদা আমার কেশবিন্যাসে বসিয়া গেলেন। সে সময়ে আমাকে ছাড়িয়া দিবার জন্যে আমি তাঁহাকে কত কাকুতি মিনতি করিলাম কিন্তু তিনি আমাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। অধিকন্তু যখন আমি বড়ই অধীর হইয়া উঠিলাম তখন তিনি কর্কশস্বরে বলিলেন "দেখ্ ছোঁড়া এবার নড়বি তো দুই গালে দুই চড় বসিয়ে দেব।" পাঁচ মিনিট পরে রতনদার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। তখন তিনি আমার সম্মুখে আরসি খানা ধরিয়া বলিলেন "দেখ্‌না শালা দেখ্‌না; এখন কা'কে দেখ্‌তে ভাল হ'লো! তোকে না তোর এই বুড়ো দাদাকে?"

প্রত্যুত্তরে আমি একবার দর্পণে আমার চেহারা খানা ভাল করিয়া দেখিয়া ঈষৎ হাসিলাম। তখন রতনদা বলিলেন "দেখিস ভাই, সাহেব দেখে যেন ভেবড়ে যাস্‌নে? মাথা ঠাণ্ডা করে' সাহেবের কথাগুলো আগে ভাল করে' শুনে তাহার পর বেশ গুছিয়ে তাহার জবাব দিস্। যদি একবার কাজে বস্‌তে পারিস্ তা' হ'লে আমি বলে' দিলুম তোর চাকরী আর মারে কে? এমন চাঁদপানা মুখ দেখ্‌লে সাহেবের মাথা ঘুরে যাবে! দাদা, আমরাও এক সময়ে

সাহেবের চাকরী করে' সংসার ধর্ম্ম ক'রেছি। সাহেবদের মেজাজ বুঝতে আমাদের আর বাকী নেই। আমরা বরাবর দেখেছি, যে লোকটার চেহারাখানা একটুকু জমকালো, যার রংটা একটু কটা,—মুখখানা ঘোরালো সে মাহিনা বাড়িবার সময় ঠিক্ দশটাকা পেয়ে বসে আছে, আর আমাদের মত কালিন্দে-কেষ্টরা গোনা পাঁচটী টাকা। তাও অতি কষ্টে।"

আমি অনুগত ভক্তের ন্যায় তদ্গতচিত্তে রতনদার বক্তৃতা সেদিন আর বেশী শুনিতে পারিলাম না। কারণ পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম তখন বেলা প্রায় সাড়ে নয়টা কাজেই দ্রুতপদে বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। রতনদাও পিছনে 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিতে বলিতে বাজারে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে আফিসে পঁহুছিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। সেদিন সাহেব আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করিয়াছিলেন। সাহেবের সঙ্গে কথা কহিবার সময় আমার মনে রতনদার উপদেশ জাগিতেছিল। তাহার ফলে আমার প্রত্যুত্তরে সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে একটী পঁচিশ টাকার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন, এবং পরদিবস হইতে কাজে যোগ দিবার জন্য আমাকে বলিয়া দিলেন।

বাড়ী আসিয়া দেখি রতনদা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন দাদা, কাজ ফতে করে' এসেছো তো?"

রতনদার কথায় আমার কেমন একটু কৌতুক করিবার প্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠিল তাই বলিলাম "হাঁ, চিরকাল যা হয়ে আসছে তাই হ'য়েছে।"

"কি গলা ধাক্কা ?"

"তা ছাড়া আর কি !"

"তাই বুঝি আজ চোখের কোণে জলের বদলে হাসির ঢেউ ! দূর শালা শাশুড়ে !"

এইবার আমি হাসিয়া ফেলিলাম। তখন আর প্রকৃত কথা গোপন করা চলিল না। আমার সফলতায় সকলেই আহ্লাদ প্রকাশ করিল বটে কিন্তু সেদিন সেই সরল বৃদ্ধ যে যথার্থ সুখ অনুভব করিয়াছিল তাহার দীপ্তিহীন নিরস চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়া তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিয়াছিল।

সাহেবে পছন্দ করিয়া লইয়াছে এই হিংসায় আফিসের অপর বাবুরা দিন কতক আমার সঙ্গে কেহই আলাপ করিল না। আমি যে বাবুটীর অধীনে নিযুক্ত হইয়াছিলাম তিনিও আমার পরিচয় গ্রহণেব কোন ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবু তোমাব কত টাকা মাহিনা হ'লো ?"

অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় গ্রহণ না করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহার আয়ের খতিয়ান লওয়া যে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ইহা জানিয়াও আমি যথাসম্ভব নম্রস্বরে বলিলাম "আজ্ঞে পঁচিশ টাকা।"

"একেবারেই পঁচিশ টাকা ?" এই বলিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী আর একটী বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন "নরেন, এখানে তোমার দেখছি আর কোন সুবিধা নাই। এখন বাহিরের লোকদেরই খাতির বেশী।"

নরেন বলিল "তাইত দেখ্ছি। আচ্ছা পরে বোঝা যাবে।"

নরেনের কথায় আমার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

কিন্তু ইহার কারণ তখন কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। ক্রমে শুনিলাম আমি যাঁহার অধীনে কাজ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলাম তাঁহার নাম প্রিয় বাবু এবং নরেন তাঁহারই পুত্র। সে তখনও এপ্রেন্টিস্ খাটিতেছিল। আমাদের ঘরে আমরা এই তিনজন ছাড়া আর কেহ বসিত না।

কাজ কর্ম্ম বুঝিতে এক মাস কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে আফিসের সকল বাবুর সঙ্গে আমার এক প্রকার আলাপ হইয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে হারু বাবুর সঙ্গে আমার বড়ই ঘনিষ্টতা হইয়াছিল। হারু বাবু বা হারাণ বাবু জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি আফিসে সিপ্‌সরকারের কাজ করিতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাহাজে রপ্তানি মাল পাঠাইয়া দিয়া কাপ্তেনের নিকট হইতে মালের রসিদ লওয়া এবং আমদানি মাল জাহাজ হইতে খালাস করিয়া আনিয়া গুদাম-জাত করা হারু বাবুর কাজ ছিল। সেই জন্য তিনি কোম্পানির নিকট হইতে আঠারোটী টাকা বেতন পাইতেন। ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণের আরও দু' পয়সা উপরি পাওনা ছিল। হারু বাবুর একে বয়স হইয়াছিল তাহার উপর হাঁপানির দৌরাত্ম্যে তিনি একেবারে ধনুকের ছিলার ন্যায় বাঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। হারু বাবু আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। টিফিনের পর যদি কোন দিন তিনি আমাকে টিফিন ঘরে একলা দেখিতে পাইতেন তাহা হইলে মালিকে পুনরায় তামাক সাজিতে বলিয়া তিনি আফিস সংক্রান্ত অনেক গুপ্তবিষয়ের রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া আমাকে ভবিষ্যতে বিশেষ সাবধান হইবার জন্য সতর্ক করিয়া দিতেন। বলা বাহুল্য সেই সঙ্গে তিনি আমার নিকট প্রত্যেক বাবুর প্রকৃতির বিশিষ্ট পরিচয় দিতে কখনও সন্দেহমনা হইতেন না। তিনি বেশ জানিতেন যে আমি ভুলেও তাঁহার এই সরল

বিশ্বাসের প্রাণঘাতী প্রতিফল দিবার বাসনায় অকৃতজ্ঞের পথ অবলম্বন করিব না।

যেদিন হারু বাবুর মুখে আমার প্রতি প্রিয় বাবু ও তাঁহার পুত্র নরেনের আন্তরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের আভাস পাইলাম সেই দিন বুঝিলাম এখানে থাকিয়া আমার অন্ন করিয়া খাওয়া বড় অধিক দিন চলিবে না। কোন অছিলায় আমার এই পঁচিশ টাকার চাকরীর মাথা খাইবার জন্য ইহারা সর্ব্বদা সচেষ্ট রহিবেন। সেদিন বাড়ী আসিয়া রতনদার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে একথা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন "ভায়া বল্‌তে কি আমিও অমন তোমার মত কত ছোঁড়ার পেছনে প্রথম প্রথম লেগে-ছিলুম; কিন্তু তাহার পর তাহারা যত পুরানো হ'য়ে আস্‌তো আমারও তাদের সঙ্গে বেশ মিল হ'য়ে যেত। দাদা, ওটা আফিসের একটা প্রধান দস্তুর। তুমি এখন এক কাজ কর। তোমার বাবু ও তাহার ছেলের দিন কতক খুব খোসামোদ লাগিয়ে দাও। তা হ'লেই দেখ্‌বে সব বাঁকা চাল সোজা হ'য়ে আসবে।"

আমি বলিলাম "এদের কাছে খোসামোদে যে কিছু হ'বে তা'ত আমার বিশ্বাস হয় না। বিশেষতঃ ছেলেটাত একটা বিচ্ছু।"

এই কথা শুনিয়া রতনদা কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন "খোসামোদে বশ হয় না এমন লোক ত আজ পর্য্যন্ত দেখ্‌লুম না। নিয়মিত রূপে দেবতার অর্চ্চনা করিলে তিনিও মুখ তুলে চান তা মানুষ কোন ছার! এই বুড়োর কথাটা শুনে তুই ভাই একবার ওদের খোসামোদ কোরেই দেখ্‌না। তাহার পর এতেও যদি তাহারা তুষ্ট না হয় তা হ'লে পিয়াদায় আক্কেল সেলামী দিয়ে যাবে।"

সেই দিন মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম যে রতনদার কথানুযায়ী চলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আর শাস্ত্রেও বলে 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্য'।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রতনদার পরামর্শমত প্রিয়বাবু এবং তাঁহার উপযুক্ত পুত্র নরেনের মন জোগাইয়া চলিতে লাগিলাম। তাহাদের মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া কাজ করিতে লাগিলাম। বাড়ী আসিবার সময় তাহাদের সঙ্গে কিছু দূর আসিয়া পুনরায় সোজা পথে ফিরিয়া বাড়ী আসিতে লাগিলাম। অবশেষে একদিন তাহাদের পিতাপুত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে আনিলাম। সেদিন হারু বাবুকেও নিমন্ত্রণ করিবার লোভ ছাড়িতে পারি নাই। ব্রাহ্মণ ইহাতে বড়ই খুসী হইয়াছিলেন। সেদিন সকলে আহারে বসিলে পর রতনদা প্রিয় বাবু এবং নরেনকে বেশ মিষ্ট ভাষায় আমার হইয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন। প্রিয় বাবুও আমার উন্নতি চেষ্টা করিবার জন্য তখন মৌখিক স্বীকৃত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু প্রাণে বোধ হয় ঈর্ষার বাতি জ্বলিতেছিল।

আহার শেষ হইলে প্রিয় বাবু পুত্রের সহিত বিদায় লইলেন। তিনি হারু বাবুকেও সঙ্গে যাইবার জন্য ডাকিয়াছিলেন কিন্তু হারু বাবু তখন ধূমপানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তাঁহাদিগকে অগ্রগামী হইতে হইয়াছিল। হারু বাবু তামাক খাইবার অছিলায় বড় বাবুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে রতনদাকে বলিলেন "দাদা, আমি এই আগুন হাতে করিয়া দিব্য করিতেছি যে যতদিন আমার দানাপানি এ আফিসে থাকিবে ততদিন রমেশের (আমার নাম) অন্ন কেহই মারিতে পারিবে না। আমি উহাকে প্রথম

হইতেই ছেলের মত ভালবেসে ফেলেছি।” এই বলিয়া হারু বাবু খুব জোবে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে রতনদা আমাকে বলিলেন “দেখ্‌লি শালা চাঁদপানা মুখের জোরটা দেখ্‌লি! দাদা, এর আগে একদিনও কি তুমি জানতে পেরেছিলে যে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমার অজ্ঞাতে তোমাকে একেবারে এতটা ভালবেসে ফেলেছে? তোমার পিছনে পিছনে হিতকারী বন্ধুর ন্যায় ওই ব্যক্তি সর্ব্বদাই ফিরিতেছে? তুমি উহার শত ভাবনার মধ্যে একটা প্রধান ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছ?” এই বলিয়া রতনদা খানিক থামিলেন। তাহার পর পুনরায় বলিলেন “ভাই, আর এক কাজ করো; ভুলেও কারুর অনিষ্ট চেষ্টা করিওনা। তাহা হইলে দেখিবে উন্নতির পথ কত সোজা, কত সরল।”

সেই মাসের মাহিনা হস্তগত হইলে আমি প্রিয় বাবুর কেশবিরহিত মস্তকের জন্য দুই শিশি কুন্তলীন এবং নরেনের জন্য একশিশি দেলখোস কিনিয়া লইয়া বাড়ী আসিলাম। পরদিবস আফিসে যাইবার পূর্ব্বে রতনদাকে আমার সঙ্কল্পের কথা জানাইয়া বলিলাম “দাদা, মুখে এত খোসা-মোদ করিতেছি তবুও বাপ বেটার মন পেলুম না। ছেলে-টাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেলে সে ত ফোঁস করিয়া উঠে। আর যিনি কর্ত্তা তিনি ত সকল কথার একটু ভূমিকা না করিয়া কখন সিধা জবাব দেন না। তাই কাল আসিবার সময় মনে করিলাম প্রিয় বাবুর জন্য দুই শিশি কুন্তলীন কিনে নিয়ে যাই; এবং নরেনকেও কিছু না দিলে সে একেবারে রাগে গস্ গস্ করিবে তাই এই দেলখোসটা তাহার জন্য আনিয়াছি। আমার এখন

কেউটের চেয়ে সলুইকে বেশী ভয়। কিন্তু দাদা, তাও বলি, এ রকম করে কি চাকরী করা পোষায়।"

রতনদা বলিলেন "দাদা, দিন কতক এই রকম ক'রে কাজ কর্ম্ম গুলো বেশ শিখে নাও তাহার পর আর কে কার খোঁজ রাখে?" শেষে বলিলেন "তা তোমার এ পলিসি মন্দ নয়। আর যদি তোমার বরাত জোরে এবং তেলের গুণে প্রিয় বাবুৰ মাথায় কচি কচি দুৰ্ব্বো ঘাসের মত চু'ল গজিয়ে উঠে তা হ'লে সে তোমাকে একটু স্নেহ না করে' কথনই থাক্‌তে পারবে না। আর অই নরেন ছোঁড়াটাকে এত ভয় করবার কোন বিশেষ কারণ দেখি না।"

সেই দিন আফিসে গিয়া প্রথমেই প্রিয় বাবুকে দুই শিশি তৈল উপহার দিলাম। বলা বাহুল্য সেদিন তাঁহার চিরগাম্ভীর্য্যসমাকীর্ণ মুখ-মণ্ডল কিছুক্ষণের জন্য হাস্যবিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল; এবং নরেনও আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিল।

সেই বৎসর পূজার সময়ে নরেনের পনর টাকা মাহিনা হইল! প্রিয় বাবু ছেলের জন্য যথাসাধ্য ওকালতী করিয়াছেন; কিন্তু সাহেব কিছুতেই তাঁহার রায় বদলাইলেন না; বরঞ্চ প্রিয় বাবুকে বলিয়াছিলেন "তোমার ছেলে যদি রমেশের মত চালাক হইত এবং কিছু লেখা পড়া বোধ থাকিত তাহা হইলে আমি কথনই রমেশকে আফিসে লইতাম না। রমেশ আজ কাল ইন্‌ভয়েসের সমস্ত কাজ একেলা করিয়া থাকে, এবং আমরাও উহাকে এ কাজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু তোমার ছেলে দুই বৎসর আফিসে থাকিয়াও একটা সামান্য এক্সচেঞ্জ কসিতে পারে না। তুমি কোন্ সাহসে তাহার হইয়া রেকমেণ্ড

করিতে আসিয়াছ? যাও, যাও, ইহার অধিক আর কিছু হইবেক না।”

প্রিয় বাবু সাহেবের কামরা হইতে বিষণ্ণবদনে নিজ স্থানে আসিয়া বসিলেন। অমনি নরেন তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। প্রিয় বাবু বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাহার জায়গায় যাইয়া বসিতে বলিলেন। গতিক যে বড় ভাল নহে আমি তাহা আভাসে বুঝিয়াছিলাম।

সেই দিন টিফিন-ঘরে হারু বাবু আমাকে প্রকৃত বিষয় জানাইয়াছিলেন। নবেনেব মাহিনা লইয়া সাহেবের সহিত প্রিয় বাবুর কথাবার্ত্তা তিনিই আমাকে বলিয়াছিলেন।

এখন আমি আব প্রিয় বাবুর তাঁবে নহি। ইন্‌ভয়েস্‌ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের চার্জ্জ এখন আমার উপর। আমার টেবিলের দুই পার্শ্বে দুইটী ড্রয়াব তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাড়ী আসিবার সময় এখন হইতে উহার মধ্যে সমস্ত কাগজ পত্র রাখিয়া চাবি বন্ধ করিয়া আসিতে হয়। চাবি দক্ষিণ দিগের ড্রয়ায়ের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিয়া আসিতাম। এখন আমাব একটী বিশেষ কাজ কমিয়াছে। প্রিয় বাবুর মনস্তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত আমাকে আর নিত্য নব পথ অন্বেষণেব জন্য মাথা ঘামাইতে হয় না। তবে উহা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। বোধ হয় ইহার কারণ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যেদিন নরেনের মাহিনা ঠিক হইল সেই দিন হইতে প্রিয় বাবুর মেজাজ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছিল। আফিসের কাজ করিতে হয় তাই তিনি করেন। এখন তাঁহাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা কবিলে প্রিয় বাবু স্বল্প কথায়

তাহার জবাব দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। সকল বিষয়ে ঔদাসীন্যের লক্ষণ দেখা যাইত। সমস্ত কাজেই গাফিলতার যেন একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ জড়িত থাকিত। নরেনের প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সে যেন কিসের অন্বেষণে নিয়ত ছোক ছোঁক করিয়া এধার ওধার ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং অবসর পাইলেই আমার উন্মুক্ত ড্রয়ারের মধ্যে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তন্মধ্যে অভ্যন্তরস্থ বস্তুগুলির একখানি সঠিক তালিকা গ্রহণ করিত। সে সময় হঠাৎ আমাদের দৃষ্টি বিনিময় ঘটিলে সে থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিত যে, আগামী মেলের জন্য সেবার কতগুলি ইনভয়েস্ বিলাতে পাঠাইতে হইবে? আমি তাহার চাতুরী বুঝিতে পারিয়াও তাহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতাম। কিন্তু নরেনের এবম্বিধ অস্বাভাবিক অস্থিরতা এবং গুপ্ত উদ্দেশ্য সাধন হেতু চতুরতার কারণ বড় অধিক দিন গোপন রহিল না। একদা বৈশাখের ঈষত্তপ্ত মধ্যাহ্নে তাহার বিদ্যাবুদ্ধি সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িল।

ইনভয়েসের সমস্ত কাজ আমার হাতে আসাতে আফিসের সকল সাহেবের সহিত আমার অল্পাধিক সংশ্রব ছিল। সুতরাং দিনের মধ্যে অনেকবার আমাকে সাহেবদের ঘরে যাওয়া আসা করিতে হইত। এক সপ্তাহের 'মেল' চলিয়া গেলে আমাকে আবার পরবর্ত্তী মেলের জন্য প্রস্তুত হইতে হইত। বস্তুতঃ অপরাপর কেরাণীর ন্যায় বৃহস্পতিবারে মেল ক্লোজ করিয়া সপ্তাহের অবশিষ্ট কয় দিবস একটু আরাম করিবার অবসর আমার ছিল না। সাহেবেরা ইহা জানিতেন, এবং সেই জন্য আমার বেতন সম্বন্ধেও ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন।

বৈশাখ মাসের কোন্ তারিখ মনে নাই এক বুধবারে রাত্রি সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত বাতি জ্বালিয়া পরদিবসের মেল সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজ এক প্রকার শেষ করিয়া বাড়ী ফিরি। পূর্ব্বের ন্যায় সে দিবসও লাল ফিতা সংলগ্ন চাবির গোছা ড্রয়ারের গায়ে ঝুলান ছিল। পরদিবস একটু সকাল সকাল আফিসে আসিয়াছিলাম। তখন বেলা নয়টার বেশী হয় নাই। সে সময়ে আফিসে কেহই আসে নাই। কেবল মাত্র পাখাটানা কুলী আমাদের ঘরের বাহিরে আমাদের অপেক্ষায় বসিয়াছিল। আমি আসিলে সে সেলাম ঠুকিয়া পাখা টানিতে আরম্ভ করিল। আমি অগ্রে লাল কালী দিয়া একখানি ছোট কাগজে 'শ্রীদুর্গা' লিখিলাম তাহার পর ড্রয়ার হইতে ইন্‌ভয়েস্‌গুলি বাহির করিয়া লইয়া একবার কসা মাজা গুলি মিলাইয়া লইলাম। বেলা দশটার পর আফিসের সমস্ত বাবু ও সাহেবরা আসিলেন। সে দিনও হারু বাবু অভ্যাস মত আমার নিকট আসিয়া একটি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে আমার মস্তক আশীর্ব্বাদ-বচনে অভিষিক্ত করিয়া তিনি নীচে গুদাম ঘরে চলিয়া গিয়াছিলেন।

বেলা একটার পর ছোট সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ছোট সাহেব প্রতি মেলের ইন্‌ভয়েস্ চেক করিয়া তাহাতে সই করিলে তবে উহা বিলাতে পাঠান হইত। একটার পর হইতে চেক আরম্ভ হইত। ছোট সাহেবের ডাক শুনিয়া ইন্‌ভয়েসের তাড়া লইয়া আমি তাঁহার কামরায় প্রবেশ করিলাম। তাহার পর সাহেবের বইয়ের সহিত মিলাইয়া চেক্ হইতে লাগিল। দুইটার কিছু পূর্ব্বে সমস্ত ইন্‌ভয়েস্ চেক্ করা শেষ হইয়া গেল; আমিও চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম। তখন ছোট সাহেব সস্মিত বদনে

আমাকে আমার প্রভূত পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ দিলেন। বলা বাহুল্য আমিও সপ্তাহের দারুণ পরিশ্রম জনিত ক্লান্তি মনিবের এবম্বিধ গুণগ্রাহিতার আতিশয্যে ত্বরায় বিস্মৃত হইলাম। তাহার পর যখন আমি আমাব নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া বসিলাম সেই সময় নরেন জিজ্ঞাসা করিল "কিহে রমেশ, সমস্ত ইন্‌ভয়েস্ চেক্ করা হয়ে গেল নাকি ?"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম "হ্যাঁ ভাই, বাঁচা গেল!"

কিঞ্চিত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "একেবারে সমস্ত ?"

তখন আমার কেমন সন্দেহ হইল। তাই তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলাম "কেন বল দেখি ; এক আধ খানা কি টেবিলে পড়েছিল ?"

"না তাই বলছিলুম ; এই এত গুলা ইন্‌ভয়েস্ এরি মধ্যে চেক্ হয়ে গেল। আর এক আধখানা পড়ে থাকবার যো কি! সাহেব বইয়ের সঙ্গে সব মিলিয়ে নিয়ে তবে ত ছেড়েছে ?"

নরেনের কথায় আমি একটি সামান্য 'হুঁ' দিয়াই নিরস্ত হইলাম।

সেই দিন বেলা চারিটার সময় বড় সাহেব আমায় তলব কবিলেন। হঠাৎ মেনেজারের ডাক শুনিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। কারণ কোন বিশেষ আবশ্যক না হইলে মেনেজার কাহারও বড় একটা খোঁজ রাখিতেন না। তদ্ব্যতীত আফিসের নূতন পুরাতন সমস্ত বাবু মেনেজারের সুদীর্ঘ মূর্ত্তিটাকে যমের ন্যায় ভয় করিত। আমিও তাহাদের দলের একজন। সুতরাং যূপকাষ্ঠবর্ত্তী উৎসৃষ্ট ছাগশিশুর ন্যায় কম্পিতকলেবরে ধীরে ধীরে মেনেজারের সুবৃহৎ কামরায় গিয়া ঢুকিলাম। সে সময়ে ছোট সাহেব

মেনেজারের বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিলেই মেনেজার তাঁহার উজ্জ্বল নীলাভাযুক্ত গোল চোখদু'টী আমার ভয়বিকম্পিত শুষ্ক মুখের উপর রাখিয়া অতি কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবু, লিভারপুলের গানির ইন্‌ভয়েস কোথায়? মিষ্টার জার্ডিন কি তোমায় উহা দেন নাই?" জার্ডিন ছোট সাহেবের নাম।

আমি কম্পিতকণ্ঠে বলিলাম "আজ্ঞে হাঁ, ছোট সাহেব যে উহা আমাকে দিয়াছিলেন তাহা আমার বেশ স্মরণ আছে। আমি উহা এখনি আমার টেবিল হইতে আনিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া দ্রুতপদে সাহেবের ঘর হইতে বাহির হইয়া একেবারে আমার টেবিলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার পর তন্ন তন্ন করিয়া ড্রয়ার দু'টী খুঁজিলাম। পার্শ্ববর্ত্তী ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি হইতে কাগজগুলি তুলিয়া তাহাদের পরীক্ষা করিলাম কিন্তু আবশ্যক ইন্‌ভয়েসের কোন সন্ধান পাইলাম না। তখন ব্যাকুল কণ্ঠে নরেনকে সমস্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "ভাই যদি পেয়ে থাক দাও, আমি তোমাকে আমার এই মাসের মাহিনা পেলেই যাহা খেতে চাও পেট ভরে তাহাই খাওয়াব। দাও ভাই, যদি নিয়ে থাক এ সময় দাও। এখন সাহেবকে দিতে না পাল্লে আমাকে জেল খাটতে হবে।"

আর বলিতে পারিলাম না, আমার গলা ধরিয়া আসিল। চক্ষুর্দ্বয় জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

গম্ভীর বদনে নরেন উত্তর দিল "বাঃ! আমি কি জানি? তুমি কি আমার কাছে উহা জিম্মা রাখিয়াছিলে যে এখন চাচ্ছ? বেশ লোক ত! তুমি এখন জেল খাট্‌বে কি পাথর ভাঙ্‌বে তা আমি কি জানি!"

অধিক বিলম্ব হইতে দেখিয়া ছোট সাহেব আমাদের ঘরে আসিয়া আমাকে ইন্‌ভয়েসের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন আমার শরীরের সমস্ত রক্ত এক সঙ্গে আমার মাথায় আসিয়া জমা হইয়াছিল। আমি জড়িতস্বরে বলিলাম "কই সেটা দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

ছোট সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন "কি বললে, দেখ্‌তে পাচ্ছনা? সেটা কোথায় গেল? তুমি জান, মার্চেন্টদের ইন্‌ভয়েসেই প্রাণ। বিশেষতঃ ঐ লিভারপুলের ইনভয়েস আমাদের হেড্‌ অফিস অনেক কষ্টে এবার অন্য পার্টির হাত থেকে সিকিওর করেছে। সেই জন্য নূতন কাজ বলিয়া উহা আমার বইয়ের মধ্যে লিষ্ট ভুক্ত ছিল না। তাই চেক্ করিবার সময় ধরা পড়ে নাই। কিন্তু উহা মেনেজারের নোট বুকে টোকা ছিল। কই, তোমার ড্রয়ার দেখি?"

আমি সরিয়া দাড়াইলাম। ছোট সাহেব ড্রয়ার দু'টী বেশ করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হইল। ইনভয়েস পাওয়া গেল না।

সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া পুনর্বার মেনেজারের কামরায় প্রবেশ করিলেন। সে সময় তাঁহারা পরস্পর যে কি বলাবলি করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। তখন আমার বোধ হইতেছিল যেন আমার চারিদিকের আলমারি সজ্জিত দেওয়ালগুলি আমাকে বেষ্টন করিয়া বর্ত্তুলাকারে ঘুরিতেছিল। আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কতক্ষণ পরে জানিনা মেনেজারের বজ্র গম্ভীরস্বরে আমার চেতনা শক্তি আনিয়া দিল। তিনি বলিলেন "হ্যালো বাবু, এই ইন্‌ভয়েসের জন্য দোষী কে?"

আমি শুষ্ককণ্ঠে কাতরস্বরে কহিলাম "আজ্ঞে আমিই দোষী। কিন্তু—"

মেনেজার বাধা দিয়া বলিলেন "আমি 'কিন্তু' শুনিতে চাহি না। কেবল যাহা জিজ্ঞাসা করি তুমি তাহারই উত্তর দাও।" তখন পুনরায় প্রশ্ন হইল "তুমি আর কাহাকেও ইন্‌ভয়েস্ দিয়াছিলে ?"

"না।"

"তবে উহা যে তোমার দ্বারাই যে-কোন প্রকারে হউক নষ্ট হইয়াছে ইহা ঠিক। কেমন ?"

"তাহা বলিতে পারি না।"

"কেন ?"

"কারণ, যখন আমি জ্ঞাতসারে এক টুক্‌রা কাগজ ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়া নষ্ট করি না তখন—"

"আমি ওসব শুনিতে প্রস্তুত নহি। এর জন্য তোমাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এখন তুমি আপনার যায়গায় যাও।"

প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে আমি বাহিরে আসিলাম। অমনি আফিসের যত বাবু—অধিক কি দপ্তরি, বিহারা অবধি আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। এবং চারিদিক হইতে অনর্গল প্রশ্নধারা আমার উপর বর্ষিত হইয়া আমাকে অধিকতর ক্লান্ত করিয়া তুলিল।

ইহাদিগের মধ্যে নরেনের ঔৎসুক্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সে কখন আমাকে প্রশ্ন করিতেছিল কখন বা ছোট সাহেবকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছিল "রমেশ very usefull hand এখন রমেশের হাতে hand-cuff লাগাও। মরে যাই আর কি 'শালুক চিনেছেন গোপালঠাকুর' !"

আফিসের চারিদিকে তখন আমার কথা লইয়া আন্দোলন চলিতেছিল।

খানিক পরে ছোট সাহেব মেনেজারের ঘর হইতে আমাকে ডাকিলেন। আমি ধীরে ধীরে টেবিলের ধারে গিয়া দাঁড়াইলাম। তখন মেনেজার বলিলেন "দেখ বাবু, আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে, আমি পুলিশ ডাকিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করি কিন্তু মিষ্টার জার্ডিন তাহা করিতে দিলেন না। তুমি বোধ হয় জান যে, জার্ডিন সাহেব তোমাকে খুব পছন্দ করিতেন। তিনি এখনও বলিতেছেন যে, এ কাজ বোধ হয় তোমার দ্বারা হয় নাই। কিন্তু এটা কেবল তাঁহার কল্পনা মাত্র। আজ তুমি আমাদের যে ক্ষতি করিলে ইহার জন্য বোধ হয় আমাকে হেড্ আফিস হইতে বিস্তর ভর্ৎসনা সহ্য করিতে হইবে। যাহা হউক আমি তোমাকে এই দণ্ডে ডিস্‌মিস্ করিলাম। তুমি এখনি আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।"

ভয়ে ভয়ে ম্যানেজারকে একটি শেষ সেলাম করিয়া যেমন আমি আমার কম্পিত মস্তকটি তুলিয়াছি সেই সময় দেখি হারুবাবু আমাদের ঘরের পাখাটানা কুলীর সহিত আমার পিছনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি সেলাম করিয়া বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিলে এক দৃঢ় মুষ্টিতে আমাকে ধরিয়া অন্য হস্তে মেনেজারকে সেলাম করিয়া হিন্দীতে বলিলেন "হুজুর আমি আপনার ইন্‌ভয়েসের খবর জানি।"

মেনেজার ব্যগ্রভাবে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে? তুমি ইন্‌ভয়েসের কি জান?"

"আমি হুজুরের চাকর। আমি আজ ত্রিশ বৎসর হুজুরের আফিসে সিপ্ সরকারের কাজ করিতেছি।"

"তুমি কি জান বল।"

"এই ছোক্‌রা রমেশ, যাহাকে আপনি এই মাত্র ডিস্‌মিস্

করিলেন, ইহার মত বিশ্বাসী প্রভুভক্ত চাকর বোধ হয় হুজুরের আর একটিও নাই। অধিক কি আমিও তদ্রূপ নহি। কিন্তু আফিসের বাবুরা কেহই ইহার অনুকূল নহে বরং সকলেই ইহার অল্লাধিক শত্রু। ইহার প্রধান শত্রু আপনার বড়বাবু প্রিয় বাবু এবং তাঁহার উপযুক্ত পুত্র নবেন তাহার সাক্ষ্য এই দেখুন।"

এই বলিয়া হারুবাবু পরিহিত অর্দ্ধমলিন বস্ত্রের এক কোণ হইতে এক খানি শত তালি সংযুক্ত কাগজ বাহির করিয়া মেনেজারের সম্মুখে রাখিলেন।

মেনেজার কাগজ খানি দেখিয়াই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "বাই জোভ, এই সেই ইন্‌ভয়েস।"

ছোট সাহেবও ততোধিক চমৎকৃত হইয়া বলিলেন "তাইত। কিন্তু এমন করিয়া ছিঁড়িয়া পুনর্ব্বার জোড়া দিলে কে?"

হারু বাবু বলিলেন "হুজুর কে ছিঁড়েছে তাহা আপনি এই পাঁচ টাকার চাকর পাখা টানা কুলীর মুখে শুনুন। এই কুলীই আমাকে ছেঁড়া ইন্‌ভয়েস্ দিয়াছে। আর আমিই জাহাজে মাল বোঝাই করিবার সময় ইহাকে পুনর্ব্বার পূর্ব্বাকারে গড়িয়া তুলিয়াছি।"

তখন পাখা টানা কুলী বলিল "হুজুরসাহেব, এই হারু বাবু আমাকে মাসে মাসে আট আনা জল খেতে দেন। ইনি বলে দিয়েছেন রোজ আট্‌টার সময় আমাকে আফিসে এসে দেখ্‌তে হবে যে কোন্ বাবু সকালে এসে কি করেন। যদি কেউ কিছু ছিঁড়ে ফেলেন, তা হলে আমাকে সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে হারু বাবুকে দিতে হয়। আজ বেলা সাড়ে আট্‌টার পর নবেন বাবু আপিসে আসেন। প্রথমে তিনি দুখানা বই খুলে কি দেখেন। তাহার পর রমেশ বাবুর

মেজের চাবি খুলে এক খানা কাগজ নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন; আর সেই ছেঁড়া কাগজ আমায় ফেলে দিতে বলেন। আমি নীচে গিয়ে গুদাম ঘরের গাঁটরীর পাশে সেগুলি রাখিয়া দিই। তাহার পর হারু বাবু আসিলে তাঁহাকে ছেঁড়া কাগজগুলি দিয়া নিশ্চিন্ত হই।"

তৎপরে সে ইন্‌ভয়েস্ খানির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "হুজুর, সাহেব, এই সেই নরেন বাবুর ছেঁড়া ইন্‌ভয়েস্।"

পাথাটানা কুলীর জবানবন্দী শুনিয়া সাহেবদ্বয় পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ী করিতে লাগিলেন। তাহার পর ছোট সাহেব হারু বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবু, তুমি এই কুলীকে মাসে আট আনা করিয়া দিয়া প্রত্যহ বেলা আটটার সময় আফিসে আসিতে বলিয়াছিলে কেন?"

হারু বাবু বলিলেন "হুজুর, আট্‌টার সময় কেন আসিতে বলিয়াছিলাম তাহা ত আপনি উহার নিজ মুখেই সমস্ত শুনিলেন। তবে কেন আমি এরকম মতলব করিয়াছিলাম, তাহা শুনিবার আপনার অধিকার আছে। আমি কেবল এই রমেশকে নিরাপদে রাখিবার জন্য, এই এতগুলি দুর্দ্দান্ত, চির-অনিষ্টকারী বাবুদের হাত হইতে এই নিরীহ বালককে রক্ষা করিবার জন্য এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম। আমি রমেশের অনিষ্টের যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম অবশেষে তাহাই ঘটিয়াছে।"

ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিলেন "রমেশ তোমার কে হয়?"

সাহেবের প্রশ্নে এইবার হারু বাবুর স্বর কাঁপিতে লাগিল। তিনি সিক্তকণ্ঠে বলিলেন "হুজুর, রমেশ আমার কেউ নয় কিন্তু রমেশ আমার সব। উহার নির্ম্মল স্বভাব, সরল প্রকৃতি এবং সর্ব্বাপেক্ষা উহার সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি এই

যুবককে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। উহার বাহির যেমন নয়নাকর্ষক, অন্তর ততোধিক পবিত্র। আমি উহাকে ছেলের মত ভালবাসি।"

এই বলিয়া হারু বাবু বস্ত্রপ্রান্তে চক্ষু মুছিলেন।

সেই সময় ছোট সাহেব বলিয়া উঠিলেন "Baboo, You are quite right!"

ম্যানেজার তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া আঠারো টাকা বেতনভোগী সিপ সরকার হারু বাবুর সহিত করমর্দ্দন করিলেন। এবং তাঁহার এই পরোপকারিতার জন্য শতবার ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তৎপরে আমার নিকট আসিয়া ধীরে ধীরে আমার অপবাদ লাঞ্ছিত মস্তকটি দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন "রমেশ, মিষ্টার জার্ডিন যে যথার্থই নির্দ্দোষীর উপর তাঁহার বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা আমি এতক্ষণে বেশ বুঝিলাম। আর তোমার গুণের পুরস্কার স্বরূপ আজ হইতে আমি তোমাকে আমাদের প্রধান নেটিভ এসিসটেণ্টের পদে নিযুক্ত করিলাম। তুমি আমার পূর্ব্ব ব্যবহার ভুলিয়া যাও।"

এইবার নরেনের খোঁজ পড়িল। ছোট সাহেব প্রিয় বাবুকে ডাকিলেন। তিনি শুষ্কমুখে সাহেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে হারু বাবু বলিলেন "হুজুর, অন্ধকার এই ঘটনার বিষয় প্রিয় বাবু কিছুই জানিতেন না। আশা করি আপনি উহাকে রেহাই দিবেন।"

সাহেব প্রিয় বাবুকে চিরকালের নিমিত্ত অবসর দিলেন। কিন্তু নরেনের সন্ধান কেহই বলিতে পারিল না। সে ইতি পূর্ব্বেই আফিস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সেদিন বাড়ী আসিবার সময় অনেক জেদ করিয়া হারু

বাবুকে আমাদের বাড়ীতে আনিয়াছিলাম। তাহার পর রতনদা'কে ডাকিয়া আনিয়া যখন একে একে সবিস্তারে হারু বাবুর কীর্ত্তিকাহিনী বলিলাম, তখন রতনদা হারু বাবুকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বলিলেন "ভাই, আমি রমেশকে সাজাইয়া গোজাইয়া বাঘের মুখে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম, কিন্তু তুমি তাহাকে সমস্ত দিবস মাতৃপক্ষপুট-নিহিত পক্ষীশাবকের ন্যায় তাহাদের দুর্দ্দান্ত আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া অবশেষে তাহার মস্তকে এই মহিমাময় স্নেহ-মুকুট পরাইয়া দিয়া আপনার অকপট বাৎসল্যের পূর্ণ পরিচয় দিলে।"

দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ প্রবীণ বন্ধুদ্বয়ের চক্ষের অবিরল আনন্দাশ্রু সেদিন আমার অভিশপ্ত মস্তকে চিরকালের নিমিত্ত যেন শান্তিবারি বর্ষণ করিয়াছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৮নং বিন্দু পালিতের গলি, জোড়াসাঁকো কলিকাতা।

ষষ্ঠ বৎসরের প্রথম পুরস্কার।

মেয়ে।

"সই তোর নাকি নতুন মা আস্‌বে?"

বেলফুলের কথায় সরসীর চোখে জল আসিল। আজ এক মাস তাহার মাতা স্বর্গে গিয়াছেন, ইহারই মধ্যে তাহার পিতা আবার নূতন গৃহিণী আনিতে চলিয়াছেন! বালিকা অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া সয়ের হাত ধরিয়া বলিল, "চল্ ভাই! তোদের বাড়ী বেড়িয়ে আসি।"

সরসীর পিতা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় স্বনামধন্য জমিদার। নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি পাঁচ শত টাকার তালুকটীকে পঁয়তাল্লিশ হাজারে পরিণত করিয়াছিলেন। দেশে বিদেশে তাঁহার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরিত। কিন্তু গ্রামের নিন্দুকেরা বলিত, অনেক অনাথা, বিধবা ও দরিদ্র ব্রাহ্মণের অশ্রুজল এবং মর্ম্মান্তিক দীর্ঘনিশ্বাসের ভিত্তির উপর এই বিপুল সম্পত্তি গঠিত। তা নষ্ট দুষ্ট লোকে যতই কেন দুর্নাম করুক না, বিপ্রদাস বাবু যে একজন বিলক্ষণ কৃতী পুরুষ, তাহা কেহই অস্বীকার করিত না।

কিন্তু তাঁহার দেশবিখ্যাত নামটী বংশধরের অভাবে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে—এই চিন্তা বিপ্রদাসের মনে সর্ব্বদা দুঃস্বপ্নের মত ঘুরিয়া বেড়াইত। যখন তিনি প্রথম পক্ষের

সন্তান সম্ভাবনা না দেখিয়া দ্বিতীয় দারগ্রহণে সঙ্কল্প করিতেছিলেন, সেই সময় বিপ্রদাসের ভবিষ্য বংশধরের সম্ভাবনা সত্য সত্যই দেখা দিল।

যে দিন পুত্ররত্ন জন্মগ্রহণ করিল, সে দিন বিপ্রদাসের দানশীলতায় তাহার শত্রুরাও মুগ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু অদৃষ্টদোষে শিশুটী চিররোগী হইল। ইহার চারি বৎসর পরে বিপ্রদাসপত্নী সন্তানসম্ভবা হইলেন। কিন্তু শুভক্ষণেই হউক কি অশুভ মুহূর্ত্তেই হউক, এবার দ্বিতীয় বংশধরের আশা লুপ্ত করিয়া সরসী শোভা মাতার কোল আলো করিয়া বসিল। বিপ্রদাস সেই দিন হইতে কন্যাটীর দিকে আর ফিরিয়া চাহিতেন না।

সরসীর জন্মের এক মাসের মধ্যে বিপ্রদাসের আদরের দুলাল চিররুগ্ন বংশধরটী তাহার পিতা মাতার বুকে বজ্রশেল বিঁধিয়া চলিয়া গেল। মাতা শোকতপ্ত হৃদয়ের উপর কন্যাকে চাপিয়া ধরিলেন। পিতা সেই দিন হইতে বাহিরের ঘরে স্থায়ী হইলেন।

কন্যার প্রতি যে মমতাহীনতা বিপ্রদাসের হৃদয়ে প্রথমে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, দিন দিন তাহা বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুরতায় পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি কঠিন আদেশ করিয়াছিলেন,—ভ্রমেও কেহ যেন অলক্ষণা মেয়েটাকে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে না আনে।

আজ মাসাবধি সরসীর মাতা গত হইয়াছেন। ভাবী বংশধরের কামনায় পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ বিপ্রদাস নূতন সংসার পাতিতে চলিয়াছেন।

২

শঙ্খধ্বনি ও উলুরবে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এক মাস পূর্ব্বে মৃত্যুর কালো ছায়া যেখানে

একটা বিভীষিকা ও অশ্রুজলের দৃশ্যপট উদ্ঘাটিত করিয়াছিল, সেখানে আজ আবার আনন্দ ও হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। সেই ক্ষণিক ব্যস্ততা ও আনন্দকোলাহল হইতে সরিয়া গিয়া বালিকা সরসী নির্জ্জন গৃহে বসিয়া কাঁদিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া তাহার মাতার সহাস্য মুখচ্ছবি তাহার চোখের কাছে ভাসিয়া উঠিতেছিল, মাতার স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণ কাণে বাজিতেছিল। বালিকার বুকের মধ্যে ক্রন্দন যেন গুমরিয়া উঠিতেছিল। পিতার নিকট তিরস্কৃত হইয়া যখন সে মার স্নেহক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া কাঁদিত, তখন মাতা তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকের উপর রাখিয়া কত সোহাগ, কত আদর করিতেন, কত উপদেশ দিতেন। আজ সেই সকল কথা তাহার বুকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল।

তাহার সে স্নেহময়ী জননী আজ কোথায়? কেহ ত এখন তাহার মুখের দিকে চাহে না! সে পিতার মুখে জন্মাবধি কখনও মিষ্ট কথা শুনে নাই। তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই তাহাকে সন্তুষ্ট হইতে হইত। পিতার স্নেহের উপর মেয়ের যে আব্দার, তাহা সে কখনও করিতে পায় নাই! কেন সে পিতার কাছেও যাইতে পায় না তাহা সে বুঝিত না। মাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কাঁদিতেন বলিয়া বালিকা মুখ ফুটিয়া আর তাহাকে কখনও জিজ্ঞাসা করে নাই। মার নিকট সে "সীতার বনবাস", "রাম-বনবাস," "নবকথা" পড়িয়াছিল। পিতৃভক্তির শত কাহিনী তাহার মাতার মুখে শুনিয়াছিল। পিতার প্রতি রামের ভক্তি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টাকে কেমন এক অজানা আকর্ষণে বিপ্রদাসের দিকে টানিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু তাহার অদৃষ্টে পিতৃস্নেহ ছিল না।

বালিকা এইরূপ কত কি ভাবিতেছিল সকলগুলি তেমন স্পষ্ট নহে, যেন আগাগোড়া হীন। কেমন একটা গোলমালের মত। ভাল করিয়া কিছু বুঝা যায় না, অথচ প্রাণটা যেন কাঁদিয়া উঠে। সবটুকু ভাল না বুঝিলেও সরসীর মনে হইতেছিল, তাহার পিতার উপর যেটুকু দাবী ছিল, আজ আর এক জন সে দাবী হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রান্ত হইয়া বালিকা মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িল। নিদ্রার শান্তিস্নিগ্ধ কোমল স্পর্শ তাহার অলস চক্ষুর উপর পদ্মহস্ত বুলাইয়া গেল। পূর্ব্বের সূর্য্য মাথার উপর আসিয়া ক্রমে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল। কিন্তু অভুক্তা মাতৃহীনা বালিকার কেহ তত্ত্ব লইল না। প্রতিবেশী যাহারা আসিয়াছিল, সকলে কার্য্য শেষ হইলে চলিয়া গিয়াছিল। যাহার কন্যা, তিনি আলবোলার নল মুখে দিয়া ষোড়শী পত্নীর কিরূপে মনোরঞ্জন করিবেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। সুতরাং বালিকা নির্জ্জন গৃহমধ্যে তেমনই পড়িয়া রহিল।

৩

যখন অপরাহ্ণের ছায়ায় দিকে দিকে শান্তি ও অবসাদ ঘনাইয়া আসিতেছিল, তখন নূতন বধূ বাপের বাড়ীর ঝীরি চাকরাণীর সহিত পতিগৃহ দেখিয়া বেড়াইতেছিল। প্রকাণ্ড বাড়িটী নির্জ্জনপ্রায়। সকল কক্ষে মনুষ্য থাকিত না। হেমাঙ্গিনী গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতেছিল। সহসা সে দেখিল, মাটীর উপর ম্লান পুষ্পের মত একটী বালিকা শুইয়া আছে। তাহার আলুলায়িত কেশ-রাশি অযত্নে মাটীতে লুটাইতেছিল। মুদ্রিত নেত্রপল্লবে ও সুন্দর গণ্ডে অশ্রুচিহ্ন তখনও মুছিয়া যায় নাই। সেই নিদ্রিত কমনীয়

মুখমণ্ডলে এমন সারল্য, এমন বিষাদছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যাহাতে নিতান্ত হৃদয়হীনের হৃদয়েও করুণা জাগিয়া উঠে।

হেমাঙ্গিনী মন্ত্রমুগ্ধের মত কয়েক মুহূর্ত্ত তাহাকে দেখিল। তার পর ক্ষীরিকে জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েটী কে?" ক্ষীরি বলিল, "বোধ হয় তোমার সতীন ঝি।"

নূতন বধূ ধীরে ধীরে বালিকার মাথা কোলে তুলিয়া লইল। সরসী সহসা চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। বিহ্বল দৃষ্টিতে সে একবার বধূমূর্ত্তির দিকে চাহিল। তার পর একে একে সকল কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। বালিকা আবার অঞ্চলে মুখ ঢাকিল।

হেমাঙ্গিনীর বুকের মধ্যে করুণার প্রস্রবণ যেন উছলিয়া উঠিল। নূতন দৃষ্টিতেই সে একেবারে বালিকাকে যেন আপনার মত ভাবিয়া লইয়াছিল। মাতৃহীনা বালিকার শত দুঃখ সে নিজেই সহ্য করিয়াছিল। হেমাঙ্গিনী সহানুভূতি ও স্নেহের সহিত বালিকাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "লক্ষ্মী, কেঁদ না, আমি আজ থেকে তোমায় মার মত ভাল বাস্‌বো।"

হেমাঙ্গিনীর স্বর মমতামধুর। বালিকা সরসী মুখ তুলিয়া চাহিল। সে দেখিল, সেই করুণাময়ী বধূমূর্ত্তির চারিদিকে যেন একটা আলোকদীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আদর করিবার সময় তাহার মার মুখে যেমন একটা শুভ্র জ্যোতিঃ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনের মধ্যে নববধূর মুখে তেমনি একটা আনন্দ-কিরণ তাহার পরলোকগত মাতৃমূর্ত্তি বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। বালিকা হেমাঙ্গিনীর গলা জড়াইয়া ধরিল।

ক্ষীরি একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল। সে ঈষৎ

বিরক্তিব্যঞ্জকস্বরে বলিল, "তুমি নতুন বৌ, লোকে বলবে কি? ছেড়ে দাও। এখনি অত ভাল নয়।'

সরসী চমকিয়া গলা ছাড়িয়া দিয়া চারবাগার দিকে চাহিল। তাহার বিবর্ণ মুখমণ্ডল আরও বিবর্ণ হইয়া গেল।

হেমাঙ্গিনী তীক্ষ্ণোজ্জ্বল দৃষ্টিতে ক্ষীরির দিকে চাহিল। তার পর দৃঢ় অনুজ্ঞার স্বরে বলিল, 'দেখ ক্ষীরি, আমি এখন ছেলে মানুষ নই, সকল কথায় তুই থাকিস নে। আমার যা ইচ্ছা তাই করবো, তুই তাতে কোন কথা ক'স নে। যা, আমার ঘরে সন্দেশ আছে, কতকগুলো বের করে নিয়ে আয়।'

৮

শরতের শুভ্র মঙ্গল জ্যোতি, নহবৎ ও ঢাকের শব্দ ষষ্ঠীর প্রভাত বড় মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। নাবর গান, বৈচিত্র্যহীন পল্লীজীবন আজ পূজার উৎসবানন্দে সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রাম্য বালক বালিকা প্রতিমার বোধন দেখিতে পূজাবাড়ী পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল।

সরসী নীচে নামিয়া যাইবার সময় একবার পিতার শয়নগৃহে উঁকি মারিল। গৃহ মধ্যে তখন কেহ ছিল না। তাহার জননীর তৈলচিত্রখানি দেওয়ালে টাঙ্গান ছিল। প্রত্যহ সুবিধা পাইলে বালিকা অন্যের অলক্ষ্যে চুপি চুপি মাতৃপ্রকৃতি দেখিয়া লইত। সে গৃহে তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। পিতা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, এ ঘরে কখনও আসিও না। প্রাণান্তেও সে গৃহের মধ্যে বালিকা প্রবেশ করিত না। তবে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া বা জানালার মধ্য দিয়া গোপনে সে মার ছবিখানি দেখিয়া লইত। অনেক সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য তাহার নিতান্ত আগ্রহ হইত। তাহার শৈশবের সহস্র স্মৃতি সেই ঘরের

মধ্যে সর্ব্বদা যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহার সাধ হইত, সেই অতীত কালের অমূর্ত্ত সঙ্গীগুলির সহিত আবার পরিচয় করিয়া লয়। কিন্তু পিতার নিষেধ স্মরণ করিয়া অতি কষ্টে সরসী সে ইচ্ছা দমন করিত।

বালিকা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ঘরের চারিদিক দেখিতে লাগিল। দেওয়ালে তাহার মাতার ছবিখানি যেন তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। ঘরের ভিতরের পুরাতন জিনিসগুলি যেন তাহাকে নীরবে ডাকিতেছিল। বালিকার পদদ্বয় যেন এক অদৃশ্য আকর্ষণের বলে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার মাতা যে টেবিলখানির উপর কত রকমের ভাল ভাল পুতুল, কাচের সাজ সজ্জা সাজাইয়া রাখিতেন, সরসী ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইল। পিতার নিষেধ-আজ্ঞা তখন একেবারেই সরসীর মনে ছিল না।

বালিকা দেখিল, তাহার মাতা যেখানে যে জিনিসটা সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেগুলি ঠিক সেইখানেই আছে। নূতন হস্তস্পর্শে কেবল মার্জ্জিত হইয়া তাহারা অতীত স্মৃতিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। মার কথা মনে করিয়া সরসীর চোখে জল আসিল। আজ এই পূজার দিনে তাহার স্নেহময়ী জননী কোথায়?

অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বালিকা আরও একটু সারিয়া গেল। এক পাশে টেবিলের উপর একটা মখমল-মোড়া অতি সুদৃশ্য বাক্স। বাক্সের ডালা খোলা। তাহার মধ্য হইতে কত কি উজ্জ্বল জিনিস দেখা যাইতেছিল। আর একটা মৃদু গন্ধ সেই স্থলটুকু সুবাসিত করিয়া তুলিতেছিল। বালিকার কৌতূহল বাড়িল, সে বাক্সটীকে একটু সরাইয়া আনিয়া দেখিল, কত রকমের চিরুণী, কাঁটা, সুগন্ধি

সাবান, রেশমী ফিতে, নানারকম সুদৃশ্য শিশিভরা গন্ধদ্রব্য।

আত্মবিস্মৃত সরসী এক এক করিয়া সবগুলি তুলিয়া দেখিতে লাগিল। একটা শিশি তুলিয়া দেখিল, "কুন্তলীন তৈল।" একটু নাড়িয়া চাড়িয়া বালিকা সেটা রাখিয়া দিল। আর একটা তুলিল, পড়িল, বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে, "দেলখোস্।" চারিদিকে নাড়িয়া দেখিল এক স্থলে লাল কালিতে লেখা রহিয়াছে,—"শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর পূজার উপহার।" নীচে তাহার পিতার নাম।

সরসীর তখন সব কথা আবার মনে পড়িল। সে যে তাহার পিতার নিষেধ অবজ্ঞা করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে! ভয়ে বালিকার মুখ শুকাইয়া গেল। যদি এই সময় কেহ আসিয়া দেখে!

বালিকার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। এমন সময় দরজার কাছে চটিজুতার শব্দ হইল। সরসী তাড়াতাড়ি শিশিটা বাক্সে রাখিতে যাইবে, এমন সময়ে কে রুক্ষস্বরে বলিল, "সরসী, কি কচ্ছিস্ ওখানে?" বালিকা বেতসপত্রের মত কাঁপিতেছিল। তাহার কম্পমান হস্ত হইতে শিশিটা মাটীতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। একটা দম্‌কা বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেলখোসের ঘন সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া দিল।

ভয়ে সরসীর মুখ মরামানুষের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল। সে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল,— সম্মুখে তাহার বাবা! বিপ্রদাস বাবুর মুখ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিয়াছিল। যুবতী পত্নীর মনোরঞ্জনের পূজার উপহার কি না হতভাগা মেয়েটা এমনি করিয়া নষ্ট করিল! তাঁহার নিষেধ না শুনিয়া চোরের মত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এ কি কম ধৃষ্টতা!

আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া বিপ্রদাস বাবু কন্যার গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন। বালিকা কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল। নির্দ্দয় প্রহারে তাহার মাথার খুলিটা পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিয়াছিল।

বিপ্রদাসের ক্রুদ্ধ চীৎকারে সমস্ত বাড়িটা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

৫

দরজার পার্শ্বে একগোছা চাবির ঝুম্ ঝুম্ শব্দ হইল। বিপ্রদাস চাহিয়া দেখিলেন, পত্নী হেমাঙ্গিনী। চকিত দৃষ্টিতে হেমাঙ্গিনী সকলি বুঝিয়া লইয়াছিল। ঝটিকার পূর্ব্বে বিদ্যুৎভরা মেঘগুলি যেমন নীরবে ও লঘু গতিতে আকাশের একদিক হইতে অপর দিকে চলিয়া যায়, হেমাঙ্গিনী ঠিক তেমনি ভাবে যেখানে সরসী বসিয়া কাঁদিতে-ছিল সেইখানে গেল; নীরবে তাহাকে কোলের উপর বসাইল। তারপর গন্ধদ্রব্যের বাক্স হইতে একটা "কুন্তলীনের" শিশি খুলিয়া খানিকটা বালিকার মাথায় ঢালিয়া দিল। "দেলখোসের" আর একটা শিশি একেবারে সরসীর কাপড়ে ঢালিয়া দিল।

বিপ্রদাসের প্রভুত্বকে যেন বিদ্রূপ করিতে করিতে সেই ঘন সুগন্ধ বালিকার চারি দিক বেষ্টন করিয়া ক্রমশঃ দরজা জানালা দিয়া বাহিরের বাতাসকে সুবাসিত করিয়া তুলিল। হেমাঙ্গিনীর গৌর মুখমণ্ডলে স্থির প্রতিজ্ঞার দীপ্তি তাহার যৌবনশ্রীকে যেন আরও নিবিড়, তাহার সৌন্দর্য্যকে যেন আরও জটিল প্রলোভনে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল।

বিপ্রদাস রাগে দশটা হইয়া ফুলিতেছিলেন; কর্কশ স্বরে তিনি বলিলেন, "কি করিলে? এত টাকার জিনিস নষ্ট করিতে হয়!"

হেমাঙ্গিনী ধীরে ধীরে বলিল, "আমার জিনিস, আমার যাহাতে সুখ হয়, আমি তাহা করিলাম; তোমার তাতে কি ?"

এত বড় কথা বিপ্রদাসের মুখের সামনে কেহ কখনও বলিতে সাহস করে নাই। অন্য কেহ হইলে এতক্ষণ একটা কুরুক্ষেত্র ব্যাপার ঘটিয়া যাইত; কিন্তু এ যে হেমাঙ্গিনী! বিপ্রদাসের সব ক্রোধ বালিকা সরসীর উপর গিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, "দেখ, তুমি ঐ মেয়েটাকে যত বেশী ভালবাসিবে, আমি ওকে তত বেশী ঘৃণা করিব, তা জান ? তবে কেন অনর্থক আমার রাগ বাড়াও !"

হেমাঙ্গিনী বিদ্যুৎকটাক্ষে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বড় পৌরুষ! নিজের মেয়েকে ঘৃণার চক্ষে না দেখিলে পুরুষত্ব বজায় থাকিবে কেন ? তোমার রাগে আমি ভয় করি না।" বলিতে বলিতে হেমাঙ্গিনীর কণ্ঠস্বর আরও উচ্চে উঠিল, তাহার চক্ষে একটা উজ্জ্বল আলোক দেখা গেল। গ্রীবা উন্নত করিয়া সে আবার বলিল, "দেখ, এক বৎসরের উপর তুমি আমায় বিয়ে করেছ; তুমি আমার স্বামী, আমার পূজনীয়; কিন্তু সত্য বলিতে কি, তোমার নিষ্ঠুর ব্যবহার, রাক্ষসের আচার দেখে আমার শতবার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হয়েছে। সরসী না তোমার মেয়ে ? তোমার রক্তে না তাহার জন্ম ? কিন্তু কি আশ্চর্য্য—তুমি ওকে মোটেই দেখতে পার না ! আমি ওকে পেটে ধরি নাই, ওর রক্তের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু আমি ওকে যতটা ভালবাসি, তুমি ওর জন্মদাতা, তার এতটুকু ভালবাসাও তোমার নাই।"

হেমাঙ্গিনীর মুখ চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতেছিল। এতগুলা কথা একেবারে বলিয়া ফেলিয়া সে হাঁপাইতে

ঝাঁপাইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সগর্ব্বে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী তুলিয়া সে ধীরে ধীরে পুনরায় কহিল, "আমি মা কালীর শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি সরসীর গায় আর কখনও হাত দাও, যদি আজ থেকে তাকে ঠিক মেয়ের মত স্নেহ না কর, তবে ঠিক জেন, আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্কই থাকিবে না। ইহাতে যদি আমার পাপ হয়, যত দিন বাঁচিব, প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

দ্রুতপদে বিপ্রদাশ-গৃহিণী অঞ্চল দোলাইয়া চলিয়া গেল। গৃহমধ্যে একটা গম্ভীর শূন্যভাব যেন কোথা হইতে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সরসী অধোমুখে কাঁদিতেছিল। পিতৃনিন্দা তাহার কোমল হৃদে বেদনার মত বাজিতেছিল। বিপ্রদাসের ব্রহ্মতালুতে কেহ যেন একটা জলন্ত লৌহদণ্ড আঘাত করিয়াছিল। এত অপমান, এত লাঞ্ছনা,—একটা মেয়ের জন্য! সেই হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটা আবার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! একটা দুরন্ত রাক্ষস-প্রকৃতি বিপ্রদাসের হৃদয়মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সজোরে বালিকার কমনীয় দেহখানির উপর পদাঘাত করিয়া বিপ্রদাস নীচে নামিয়া গেলেন।

মূর্চ্ছিত সরসী ভূমিতলে পড়িয়া রহিল। তাহার চারি ধারে "দেলখোসের" মৃদু সৌরভ আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

৬

বিপ্রদাস দিবানিদ্রার পর আলবোলায় ধূমপান করিতেছিলেন। বৃদ্ধ দেওয়ান আসিয়া বলিলেন, "মা ঠাকুরাণী পালকী আনাইয়া বাপের বাড়ী চলে গেছেন।"

বৃদ্ধ রামগতি দেওয়ানজী কথাটা বুঝাইয়া বলিলেন, বিপ্রদাসের হাতের নল পড়িয়া গেল। উদ্বেলিত স্বরে বৃদ্ধ

জমিদার আপনা আপনি বলিলেন, "আমায় না বলিয়া গেল?" ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঘোড়া তৈয়ার কর।"

পুরাতন দেওয়ানজী হাত কচলাইয়া আবার বলিলেন, "আর একটি কথা, দিদিবাবুর বড় জ্বর হইয়াছে। মুখ দিয়া রক্ত উঠিতেছে। একেবারে অচৈতন্য। একবার তাহাকে দেখিয়া আসিলে ভাল হয়।"

মুখ বিকৃত করিয়া দারুণ ঘৃণার সহিত বিপ্রদাস বলিলেন, "আপদটা মরে গেলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। কি কুক্ষণে মেয়েটা আমার ঘরে এসেছিল। ওর জন্য হ'তেই আমার সর্ব্বনাশ হলো। আমার দেখতে যাবার এখন অবকাশ নাই।" এই বলিয়া বিপ্রদাস বেশপরিবর্ত্তন করিয়া অভিমানিনী পত্নীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন।

বৃদ্ধ রামগতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধন্বন্তরী মহাশয়কে স্বয়ং সংবাদ দিতে গেলেন। সরসী যে তাহার মেয়ের সই; তাহাকে যে আশৈশব বুকে পিঠে করিয়া তিনি মানুষ করিয়াছেন।

৭

রাত্রে যখন সরসীর জ্ঞান হইল, তখন দেখিল, সইমা শিয়রে বসিয়া তাহার বুকে ঔষধ লেপন করিতেছেন। সে একবার বুকে হাত দিয়া দেখিল—বড় বেদনা। সরসী ধীরে ধীরে ডাকিল, "সইমা!"

কয় রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া সইমার চোখ ঘুমে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; তিনি নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "কি মা?"

বালিকা অতি ধীরে ধীরে বলিল, "আমার কত দিন অসুখ সইমা?"

সইমা বলিলেন, "কাল একুশ দিন গেছে বাছা! তুমি একটু ঘুমোও।"

সরসী থামিল না। সে বলিতে লাগিল, "সইমা, আমি যেন স্বপ্নে দেখছিলাম, বাবার পা ভেঙ্গে গেছে। তিনি যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে কাঁদছেন। আর সকলে চুপ করে দাড়িয়ে আছে। কেউ তার সেবা কচ্ছে না। হাঁ সইমা! বল না, বাবা কেমন আছেন?"

সইমা বিস্মিত হইলেন। বিপ্রদাস বাবু স্ত্রীকে ফিরাইতে গিয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়াছেন, এ কথা কেহ সরসীর নিকট বলে নাই, অথচ বালিকা জানিল কেমন করিয়া!

বালিকা বলিল, "সইমা! সত্যি করে বল, বাবা আমার কেমন আছেন? আগা! চুপ করে রৈলে কেন? আমায় তাঁর কাছে নিয়ে চল সইমা! মা আমায় স্বপ্নে বলে গেছেন বাবার আমি যেন সেবা সুশ্রূষা করি।"

সইমার চোখে জল আসিল। এমন বাপের এমন মেয়ে! তিনি বলিলেন, "অমন করে বেশী কথা কইলে আমি কোনও কথা বলিব না। তোমার বাপের পা ভেঙ্গেছিল বটে, কিন্তু এখন অনেকটা সেরে উঠেছেন। তুমি আর কথা কহিও না। কবিরাজ মহাশয় শুনিলে আমায় বড় বকবেন। এখন চুপ করে ঘুমোও।"

সরসীর ইচ্ছা হইল, সেই মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গিয়া পিতার রোগশয্যার পার্শ্বে বসে। আহা! কে তাঁহার সেবা করিবে? বালিকা মানসনেত্রে ভগ্নপদ পিতার অবস্থা কল্পনা করিয়া লইল। বৃদ্ধের যন্ত্রণা বালিকা মনে মনে যেন অনুভব করিল। সরসী আবার বলিল, "সই মা, ছোটমা কোথায়? তিনি বাবার সেবা করিতেছেন না?" তিনি বলিলেন,

"বাপের বাড়ী গিয়ে তাঁর বড় জ্বর হয়েছে। নাও, আর কথা কহিও না। আমি আর উত্তর দিব না।"

বালিকা বিছানায় শুইয়া কেবল ছটফট্ করিতে লাগিল।

৮

ঘরের মধ্যে এক কোণে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল। ম্লান আলোক গৃহমধ্যস্থ সমুদয় অন্ধকার দূর করিতে পারে নাই। এক পার্শ্বে একজন ভৃত্য সারারাত্রি জাগিয়া জাগিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছিল। বিপ্রদাসের চক্ষে নিদ্রা নাই। জ্বরের জ্বালায় শরীর দগ্ধ হইতেছিল। পায়ের যন্ত্রণা তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছিল। আবার থাকিয়া থাকিয়া কি একটা অজানা বেদনা বুকের মধ্যে বাজিয়া উঠিতেছিল। রুগ্নশয্যায় আত্মকৃত পাপ, আত্মগ্লানি ও অনুশোচনা প্রায়শ্চিত্ত করিবার শুভ অবসর পাইয়া থাকে। বিপ্রদাসের বুকের মধ্যে এইরূপ সহস্র যন্ত্রণা উঁকি মারিতে ছিল। জীবনের সহস্র পাপ বড় বড় অক্ষরের মত তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

বিনিদ্রনয়নে চাহিতে চাহিতে বিপ্রদাস দেওয়ালস্থ তৈলচিত্রের প্রতি চাহিলেন। অস্পষ্ট আলোকে তিনি যেন অনুভব করিলেন, সেই চিত্রিত চক্ষুযুগল সত্য সত্যই যেন তাঁহার দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। যেন তিনি অনুভব করিলেন, সেই কাতর চক্ষুযুগল নীরবে ভূমিতলে তাঁহাকে চাহিতে অনুরোধ করিতেছে। বিপ্রদাস নয়ন নিমীলিত করিলেন। দেখিলেন, সেই দৃষ্টি তাঁহার দিকে তেমনি স্থিরভাবে নিবদ্ধ। অতি কষ্টে বিপ্রদাস পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেন। আজ তিন সপ্তাহ তিনি শয্যাশায়ী। এই তিন সপ্তাহ তিনি যেরূপ মানসিক যন্ত্রণা

ভোগ করিতেছেন, সমুদয় জীবনে তেমন আর সহ্য করিতে হয় নাই।

বিপ্রদাস আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তখনি বোধ হইল, একটী বালিকা ভূমিতলে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে; তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতেছে। বিপ্রদাসের শরীরের রক্ত যেন বরফের মত শীতল হইয়া গেল। তাঁহার বোধ হইল, বালিকাটী মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তাহার কাতরোক্তি সহস্র বেদনার মত তাঁহার বুকের মধ্যে বিদ্ধ হইতে লাগিল। বালিকার মৃত্যুযন্ত্রণা-কাতর চক্ষু দুইটী যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া কি মিনতি করিতেছে।

বিপ্রদাসের হৃদয়ের একটা রুদ্ধভাগ সহসা যেন কোন মন্ত্রবলে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। অতৃপ্ত স্নেহের সহস্র তরঙ্গ প্লাবনের মত তাঁহার বুকের মধ্যে ওতপ্রোত হইতে লাগিল। পীড়া-কাতর দুর্ব্বল মস্তিষ্ক আর ধারণা করিতে পারিল না, বিপ্রদাস অস্ফুট কাতরোক্তি করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চৈতন্যের সহিত বিপ্রদাস অনুভব করিলেন, কাহার শীর্ণ ক্ষুদ্র অঙ্গুলি তাঁহার মস্তকে ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হইতেছে। কাহার ক্ষীণ মৃদু নিশ্বাস তাঁহার উত্তপ্ত কপোল স্পর্শ করিতেছে। সংশয়ান্বিত হইয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধ চাহিলেন। বোধ হইল, স্বর্গের কোন দেবকন্যা যেন তাঁহার শিয়রে বসিয়া। কিন্তু বালিকার রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখমণ্ডল, সহানুভূতিস্নিগ্ধ ক্লান্ত নয়ন মুহূর্ত্ত মধ্যে বিপ্রদাসের ভ্রান্তি ঘুচাইয়া দিল।

গুহা-নির্গত জাহ্নবীর রুদ্ধ বারিপ্রবাহের মত কতদিনের সঞ্চিত স্নেহ বিপ্রদাসের বুকের লৌহ-কপাট ঠেলিয়া ফেলিয়া উন্মাদ উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া বাহির হইল। বিপ্রদাস চীৎকার

করিয়া কন্যার গলা জড়াইয়া বলিলেন, "মা, মা, আয় মা, আমার বুকের ধন বুকে আয়! আর আমি তোকে মারবো না, আর তোকে অযত্ন করবো না।"

অশ্রুভরে বিপ্রদাসের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। বালিকা পিতার জ্বরতপ্ত বুকের উপর মাথা রাখিল। এ কি সুখ, এ কি শান্তি! বিপ্রদাসের জীবনে এমন মধুময় মূহুর্ত্ত অনেক দিন আসে নাই।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।
১৪।১, চেতলা রোড, চেতলা।

সপ্তম বৎসরের প্রথম পুরস্কার।

মন্দির।

১

এক গ্রামে নদীর তীরে দু'ঘর কুমোর বাস করিত। তাহারা নদীর মাটী তুলিয়া ছাঁচে ফেলিয়া পুতুল তৈরি করিত, আর হাটে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিত। চিরকাল তাহারা এই কাজ করে, চিরকাল এই মাটীর পুতুল, তাহাদিগের পরণের বস্ত্র ও উদরের অন্ন যোগাইয়া থাকে। মেয়েরা কাজ করে, জল তুলে, রাঁধিয়া স্বামী পুত্রকে খাওয়ায় এবং নিবান ভস্মস্তূপের ভিতর হইতে পোড়া পুতুল বাহির করিয়া আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া চিত্রিত হইবার জন্য পুরুষদের হাতের কাছে আগাইয়া দেয়।

শক্তিনাথ এই কুম্ভকার পরিবার মধ্যে আসিয়া স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। রোগক্লিষ্ট, ক্ষীণদেহ এই ব্রাহ্মণকুমার, তাহার বন্ধুবান্ধব, খেলাধূলা, লেখাপড়া সব ছাড়িয়া দিয়া এই মাটীর পুতুলের পানে অকস্মাৎ একদিন ঝুঁকিয়া পড়িল। সে বাঁশের ছুরি ধুইয়া দিত, ছাঁচের ভিতর হইতে পরিষ্কার করিয়া মাটী চাঁচিয়া ফেলিত এবং উৎকণ্ঠিত ও অসন্তুষ্ট চিত্তে, পুতুলের চিত্রাঙ্কণ কার্য্য কৈমন অসাবধানতার সহিত সমাধা হইতেছে, তাহাই দেখিত। কালি দিয়া পুতুলের ভ্রূ, চক্ষু, ওষ্ঠ প্রভৃতি লিখিত হইত; কোনটার

ভ্রূ মোটা, কোনটার আধখানা, কাহারো বা ওষ্ঠের নীচে কালির আঁচড় লাগিয়া থাকিত। শক্তিনাথ অধীর ঔৎসুক্যে আবেদন করিত, "সরকার দাদা, অমন তাচ্ছিল্য কোরে আঁক্‌চ কেন?" সরকার দাদা অর্থাৎ কারিগর সস্নেহে হাসিয়া জবাব দিত, "বামুন ঠাকুর, ভাল কোরে আঁক্‌তে গেলে বেশী দাম লাগে, অত কে দেবে বল? এক পয়সার পুতুল ত আর চার পয়সায় বিকোবে না!"

২

এই সহজ কথাটার অনেক আলোচনা করিয়াও শক্তিনাথ আধখানা মাত্র বুঝিয়াছিল। এক পয়সার পুতুল ঠিক এক পয়সায় বিকাইবে, তাহার ভ্রূ থাকুক, আর আধখানা ভ্রূ না থাকুক! দুই জোড়া চক্ষু সমান অসমান যাই হউক, সেই এক পয়সা! মিছামিছি কে এত পরিশ্রম করিবে? পুতুল কিনিবে বালকে, দু'দণ্ড তাহাকে আদর করিবে, শোয়াইবে, বসাইবে, কোলে করিবে,—তারপর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিবে,—এই ত? শক্তিনাথ বাটী হইতে সকালবেলা যে মুড়ি-মুড়কি কাপড়ে বাঁধিয়া আনিয়াছিল, তাহার ভুক্তাবশিষ্ট এখনো বাঁধা আছে, তাহাই খুলিয়া অতিশয় অন্যমনস্কভাবে চিবাইতে চিবাইতে, ছড়াইতে ছড়াইতে সে তাহাদের জীর্ণ বাটীর প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। বাটীতে কেহ নাই। ভগ্ন-স্বাস্থ্য বৃদ্ধ পিতা জমিদার বাটীতে মদনমোহন ঠাকুরের পূজা করিতে গিয়াছেন। ভিজা আলোচাল, কলা মূলা প্রভৃতি উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্য বাঁধিয়া আনিবেন, তাহার পর পাক করিয়া পুত্রকে খাওয়াইবেন, নিজেও খাইবেন। বাড়ীর উঠান কুঁদফুল, করবীফুল ও সেফালীফুলগাছে পূর্ণ। গৃহলক্ষ্মীহীন বাটীটার সর্ব্বত্রই জঙ্গল; কিছুতে শৃঙ্খলা নাই, কাহারো পারিপাট্য নাই। বৃদ্ধ

ভট্টাচার্য্য মধুসূদন কোনরূপে দিনপাত করেন। শক্তিনাথ, ফুল পাড়িয়া, ডাল নাড়িয়া, পাতা ছিঁড়িয়া উঠানময় অন্যমনস্কভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

প্রতিদিন সকালবেলা শক্তিনাথ কুমোরবাড়ী যায়। আজকাল, সে পুতুলে রং দিবাব অধিবার পাইয়াছে। তাহার সরকার-দাদা সযত্নে সব চেয়ে ভাল পুতুলটা তাহাকে বাছিয়া দিয়া বলে, "নাও দাদাঠাকুর, তুমি চিত্তির কর।" দাদাঠাকুর এক বেলা ধরিয়া একটি পুতুল চিত্রিত করে। হয় ত, খুব ভালই হয়, তবু এক পয়সার বেশী দাম উঠে না। সরকাব-দাদা কিন্তু বাটী আসিয়া বলে, বামুনঠাকুরের 'চিত্রি করা' পুতুলটি দু'পয়সায় বিকিয়েছে।—শুনিয়া শক্তিনাথের আব আনন্দ ধরে না।

৩

এ গ্রামের জমিদার কায়স্থ। দেব দ্বিজে তাহার বাড়াবাড়ি ভক্তি। গৃহদেবতা নিকষনির্ম্মিত মদন-মোহন বিগ্রহ; পার্শ্বে সুবর্ণরঞ্জিত শ্রীরাধা,—অত্যুচ্চ মন্দিরে রৌপ্য সিংহাসনে তাঁহারাই প্রতিষ্ঠিত। বৃন্দাবনলীলার কত অপরূপ চিত্র মন্দির গাত্রে সংলগ্ন। উপরে কিংখাপের চন্দ্রাতপ, তাহাতে শত শাখার ঝাড় দুলিতেছে। এক পার্শ্বে, মর্ম্মর-বেদীর উপর পূজার উপকরণ সজ্জিত, এবং নিত্যনিবেদিত পুষ্প চন্দনের ঘন সৌরভে মন্দিরাভ্যন্তর সমাচ্ছন্ন। বুঝি, স্বর্গসুখ ও সৌন্দর্য্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে, এই পুষ্প ও গন্ধ পূজার প্রথম উপচার হইয়া আছে, এবং তাহারই সুকোমলসুরভি বায়ুর স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইয়া এই মন্দির বায়ুকে নিবিড় করিয়া রাখিয়াছে।

৪

অনেক দিনের কথা বলিতেছি। জমিদার রাজনারাণ

বাবু যখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়া প্রথম বুঝিলেন যে, এ জীবনের ছায়া ক্রমশঃ দীর্ঘ ও অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে, যে দিন সর্ব্ব প্রথম বুঝিলেন যে, এ জমিদারী ও ধন, ঐশ্বর্য্য ভোগের মিয়াদ প্রতিদিনই কমিয়া আসিতেছে; প্রথম যে দিন মন্দিরের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চোখ দিয়া অনুতাপাশ্রু বিগলিত হইয়াছিল, আমি সেই দিনের কথা বলিতেছি। তখন তাহার একমাত্র কন্যা অপর্ণা পাঁচ বৎসরের বালিকা; পিতার পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া একমনে সে দেখিত, মধুসূদন ভট্টাচার্য্য চন্দন দিয়া কাল পুতুলটি চর্চ্চিত করিতেছেন, ফুল দিয়া সিংহাসন বেষ্টন করিতেছেন, এবং তাহারই স্নিগ্ধ গন্ধ, আশীর্ব্বাদের মত তাহাকে যেন স্পর্শ করিয়া ফিরিতেছে। সেই দিন হইতে প্রতিদিনই এই বালিকা সন্ধ্যার পর, পিতার সহিত ঠাকুরের আরতি দেখিতে আসিত এবং এই মঙ্গল উৎসবের মধ্যে অকারণে বিভোর হইয়া চাহিয়া থাকিত।

ক্রমে অপর্ণা বড় হইতে লাগিল। হিন্দুর মেয়ে ঈশ্বরের ধারণা যেমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করে, সেও তাহাই করিতে লাগিল, এবং পিতার নিতান্ত আদরের সামগ্রী এই মন্দিরটী যে তাহারও বক্ষ-শোণিতের মত, এ কথা সে তাহার সমস্ত কর্ম্ম ও খেলাধূলার মধ্যেও প্রমাণ করিতে বসিল। সমস্ত দিন সে এই মন্দিরের কাছাকাছি থাকিত এবং একটি শুষ্ক তৃণ বা একটি শুষ্ক ফুল ও সে মন্দিরের ভিতর পড়িয়া থাকা সহ্য করিতে পারিত না। এক ফোঁটা জল পড়িলে সে সযত্নে আঁচল দিয়া তাহা মুছিয়া লইত। রাজনারাণ বাবুর দেবনিষ্ঠা লোকে বাড়াবাড়ি মনে করিত, কিন্তু অপর্ণার দেবসেবা-পরায়ণতা সে সীমাও অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল। সাবেক পুষ্পপাত্রে আর ফুল আঁটে না—একটা

বড় আসিয়াছে। চন্দনের পুরাতন বাটীটা বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভোজ্য ও নৈবেদ্যের বরাদ্দ ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। এমন কি, নিত্য নূতন ও নানাবিধ পূজার আয়োজন ও তাহার নিখুঁত বন্দোবস্তের মাঝে পড়িয়া বৃদ্ধ পুরোহিত পর্য্যন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। জমিদার রাজনারাণ বাবু এ সব দেখিয়া শুনিয়া ভক্তি স্নেহে গাঢ়স্বরে কহিতেন, "ঠাকুর আমার ঘরে তাঁহার নিজের সেবার জন্য লক্ষ্মীকে পাঠাইয়া দিয়াছেন,—তোমরা কেহ কিছু বলিয়ো না।"

৫

যথা সময়ে অপর্ণার বিবাহ হইয়া গেল। মন্দির ছাড়িয়া এইবার যে তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইবে, এই আশঙ্কায় তাহার মুখের হাসি অসময়ে শুকাইয়া গেল। দিন দেখান হইতেছে, তাহাকে শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইবে। পরিপূর্ণ বিদ্যুৎ বুকে চাপিয়া বর্ষার ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ড যেমন অবরুদ্ধ গৌরবের গুরুভারে স্থির হইয়া কিছুক্ষণ আকাশের গায়ে নিঃশেষ বর্ষণোন্মুখ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, তেমনি স্থির হইয়া একদিন অপর্ণা শুনিল যে সেই দেখান-দিন আজ আসিয়াছে। সে পিতার নিকট গিয়া কহিল, "বাবা, আমি ঠাকুর সেবার যে সব বন্দোবস্ত করিয়া গেলাম তাহার যেন অন্যথা না হয়।" বৃদ্ধ পিতা কাঁদিয়া ফেলিলেন,—"তাইত মা!—না, অন্যথা কিছুই হবে না।" অপর্ণা নিঃশব্দে চলিয়া আসিল। তাহার মা নাই, সে কাঁদিতে পারিল না; বৃদ্ধ পিতার দু' চোক ভরা জল, সে রাগ করিবে কি করিয়া? তাহার পর যোদ্ধা যেমন করিয়া তাহার ব্যথিত ক্রন্দনোন্মুখ বীরহৃদয় পৌরুষ-শুষ্ক হাসিতে চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক চলিয়া যায়, তেমনি করিয়া অপর্ণা শিবিকারোহণে

গ্রাম ত্যাগ করিয়া অজানা কর্ত্তব্যের শাসন মাথা পাতিয়া লইয়া চলিয়া গেল। নিজের উচ্ছ্বসিত অশ্রু মুছিতে গিয়া তাহার মনে পড়িল—পিতার অশ্রু মুছাইয়া আসা হয় নাই। তাহার নিজের হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্রমাগত তাহার কাছে যেন কত নালিশ করিতে লাগিল। একে তাহার হৃদয় শত ব্যথায় বিদ্ধ, তাহার পর কোথায় কোন্ গ্রামান্তের মন্দির হইতে যখন সন্ধ্যার শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তখন সেই আজন্ম পরিচিত আরতির আহ্বান শব্দ তাহার কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে নৈরাশ্যের হাহাকার বহন করিয়া আনিল। চট্ ফট্ করিয়া অপর্ণা শিবিকার দ্বার উন্মোচন করিয়া ফেলিল, এবং সন্ধ্যার অন্ধকারের ভিতর দিয়া দেখিতে লাগিল, ছায়ানিবিড় একটা উচ্চ দেবদারু শিখায় একটা পরিচিত মন্দিরের কল্পিত সমুন্নত চূড়া দেখিয়া, সে উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার শ্বশুর বাটীর একজন দাসী পিছনেই চলিয়া আসিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কহিল, "ছি বৌমা, অমন করে কি কাঁদিতে আছে মা, শ্বশুর ঘর কে না করে?" অপর্ণা দুই হাতে মুখ চাপিয়া রোদন নিবারণ করিয়া পাল্‌কির কবাট বন্ধ করিয়া দিল!

ঠিক সেই সময়টীতেই মন্দিরের ভিতর দাঁড়াইয়া পিতা রাজনারাণ মদন-মোহন ঠাকুরের পার্শ্বে ধূপ ধূনার ধূমে ও চক্ষুজলে অস্পষ্ট একখানি দেবীমূর্ত্তির অনিন্দ্য সুন্দর মুখে প্রিয়তমা দুহিতার মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

৬

অপর্ণা স্বামী গৃহে। সেথায় তাহার ইচ্ছাহীন স্বামী সম্ভাষণের ভিতর এতটুকু আবেগ, এতটুকু চাঞ্চল্যও প্রকাশ পাইল না। প্রথম প্রণয়ের স্নিগ্ধ সঙ্কোচ, মিলনের সলজ্জ উত্তেজনা, কিছুই তাহার ম্লান চক্ষু দুটীর পূর্ব্ব দীপ্তি ফিরাইয়া

আনিল না। প্রথম হইতেই স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই যেন পরস্পরের কাছে কোন দুর্ব্বোধ অপরাধে অপরাধী হইয়া রহিল; এবং তাহারই ক্ষুব্ধ-বেদনা কুলপ্লাবিনী উচ্ছ্বসিত তটিনীর ন্যায় একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নির্ম্মাণ করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন অনেক রাত্রে, অমরনাথ ধীরে ধীরে ডাকিয়া কহিল, "অপর্ণা, তোমার এখানে থাকিতে কি ভাল লাগে না?" অপর্ণা জাগিয়াছিল, বলিল "না।"

অমর। বাপের বাড়ী যাইবে?

অপর্ণা। যাইব।

অমর। কাল যাইতে চাও?

অপর্ণা। "চাই।" ক্ষুব্ধ অমরনাথ জবাব শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আর, যদি যাওয়া না হয়?" অপর্ণা কহিল, "তা'হ'লে যেমন আছি তেমনি থাকিব।" আবার কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া থাকিল; অমরনাথ ডাকিল, "অপর্ণা!" অপর্ণা অন্যমনস্ক-ভাবে বলিল, "কি!"

"আমাকে কি তোমার কোন প্রয়োজন নাই?" অপর্ণা গায়ের কাপড় চোপড় সর্ব্বাঙ্গে বেশ করিয়া টানিয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে শুইয়া বলিল, "ওসব কথায় বড় ঝগড়া হয়, ওসব বলিওনা।"

"ঝগড়া হয়—কি করিয়া জানিলে?"

"জানি, আমাদের বাপের বাড়ীতে মেজ দাদা ও মেজ বউ এই লইয়া নিত্য কলহ করে। আমার ঝগড়া কলহ, ভাল লাগে না।" শুনিয়া অমরনাথ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া সে যেন এই কথাটাই এতদিন খুঁজিতে ছিল, হঠাৎ আজ যেন তাহা হাতে ঠেকিল,

বলিয়া উঠিল,—"এস অপর্ণা আমরাও ঝগড়া করি। এমন করিয়া থাকার চেয়ে ঝগড়া কলহ ঢের ভাল!" অপর্ণা স্থিরভাবে কহিল, "ছি, ঝগড়া কেন করিতে যাইব? তুমি ঘুমাও।"

তাহার পর অপর্ণা ঘুমাইল কি জাগিয়া রহিল, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়াও অমরনাথ বুঝিতে পারিল না।

প্রত্যূষে উঠিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত দিন অপর্ণার কাজ কর্ম্মে ও জপ তপে কাটিয়া যায়। এতটুকু রঙ্গরস বা কৌতুকের মধ্যে সে প্রবেশ করেনা, দেখিয়া তাহার সম বয়সীরা বিদ্রূপ করিয়া কত-কি বলে, ননদেরা 'গোসাই ঠাকুর' বলিয়া পরিহাস করে, তথাপি সে দলে মিশিতে পারিল না; কেবলি তাহার মনে হইতে লাগিল, দিনগুলা মিছা কাটিয়া যাইতেছে। আর এই যে অলঙ্ঘ্য আকর্ষণে তাহার প্রতি শোণিত-বিন্দু, সেই পিতৃপ্রতিষ্ঠিত মন্দির অভিমুখে ছুটিয়া যাইবার জন্য পূর্ণিমার উদ্বেলিত সিন্ধুবারির মত হৃদয়ের কূলে উপকূলে অহঃরহঃ আছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার সংযম কিসে হইবে? ঘরকন্নার কাজে, না ছোট খাট হাস্য পরিহাসে? ক্ষুব্ধ অসুস্থ চিত্ত তাহার এই যে বিপুল ভ্রান্তি মাথায় করিয়া আপনা-আপনি পাক খাইয়া মরিতেছে, তাহার নিকট স্বামীর আদর ও স্নেহ, পরিজন-বর্গের প্রীতি-সম্ভাষণ ঘেঁসিবে কি করিয়া? কি করিয়া সে বুঝিবে, যে, কুমারীর দেবসেবা দ্বারা নারীত্বের কর্ত্তব্যের সবটুকু পরিসর পরিপূর্ণ করা যায় না।

৭

অমরনাথের বুঝিবার ভুল,—সে উপহার লইয়া স্ত্রীর কাছে আসিয়াছে। বেলা তখন ন'টা দ'শটা। স্নানান্তে অপর্ণা পূজা করিতে যাইতেছিল। গলার স্বর, যতটা

সম্ভব মধুর করিয়া অমর কহিল, "অপর্ণা, তোমার জন্য কিছু উপহার আনিয়াছি ; দয়া করিয়া লইবে কি ?" অপর্ণা হাসিয়া বলিল,—"লইব বৈকি !" অমরনাথ আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। আনন্দে সৌখীন রুমালে বাঁধা একটা সৌখীন বাক্সের ডালা খুলিতে বসিল। ডালার উপরে অপর্ণার নাম সোনার জলে লেখা। এখন একবার সে অপর্ণার মুখখানি দেখিবার জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু দেখিল, মানুষে কাচের নকল চোখ পরিয়া যেমন করিয়া চাহে, তেমনি করিয়া অপর্ণা তাহার পানে চাহিয়া আছে ! দেখিয়া তাহার সমস্ত উৎসাহ এক নিমিষে নিমিয়া গিয়া যেন অর্থহীন একফোঁটা শুষ্ক হাসির মাঝে আপনাকে লুকাইয়া ফেলিতে চাহিল। লজ্জায় মরিয়া গিয়াও সে বাক্সের ডালা খুলিয়া গোটাকতক কুন্তলীনের শিশি, আরো কি-কি বাহির করিতে উদ্যত হইলে, অপর্ণা বাধা দিয়া কহিল, "উহাই কি আমার জন্য এনেছ ?" অমরনাথের হইয়া আর কে যেন জবাব দিল,—"হাঁ, তোমার জন্যই আনিয়াছি।" দেলখোস গুলো—" ; অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "বাক্সটাও কি আমাকে দিলে ?"

"নিশ্চয়ই।"

"তবে আর কেন মিছা ওসব বাহির করিবে বাক্সতেই থাক্।" "তা থাক্। তুমি ব্যবহার করিবে ত ?" অকস্মাৎ অপর্ণা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। সমস্ত দুনিয়ার সহিত লড়াই করিয়া তাহার ক্ষত বিক্ষত হৃদয় পরাস্ত হইয়া বৈরাগ্য গ্রহণ পূর্ব্বক নিভৃতে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, সহসা তাহার গায়ে এই স্নেহের অনুরোধ কুৎসিত বিদ্রূপের আঘাত করিল ; চঞ্চল হইয়া সে তৎক্ষণাৎ প্রতিঘাত করিল ; বলিল, "নষ্ট হইবে না, রাখিয়া দাও। আমি ছাড়া আরো

অনেকে ব্যবহার করিতে জানে।” এবং উত্তরের জন্য অপেক্ষা মাত্র না করিয়া অপর্ণা পূজার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। আর অমরনাথ,—বিহ্বলের মত সেই প্রত্যাখ্যাত উপহারের উপর হস্ত রাখিয়া সেই ভাবেই বসিয়া রহিল। প্রথমে সে সহস্রবার মনে মনে আপনাকে নির্ব্বোধ বলিয়া তিরস্কার করিল। বহুক্ষণ পরে সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“অপর্ণা পাষাণী,” তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিল—সেইখানে বসিয়া, একভাবে ক্রমাগত চক্ষু মুছিতে লাগিল। অপর্ণা তাহাকে যদি সুস্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিত, তাহা হইলে কথাটা অন্যরূপ দাঁড়াইতে পারিত। সে যে প্রত্যাখ্যান না করিয়াও প্রত্যাখ্যানের সবটুকু জ্বালা তাহার গায়ে মাখাইয়া দিয়া গিয়াছে, ইহার প্রতিকার সে কি করিয়া করিবে? অপর্ণাকে তাহার পূজার আসন হইতে টানিয়া আনিয়া তাহারই সম্মুখে তাহার উপেক্ষিত উপহারটা নিজেই লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, এবং সর্ব্ব সমক্ষে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিবে যে সে মুখ আর দেখিবে না? সে কি করিবে, কত কি বলিবে, কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইবে: হয় ত, ছাই মাখিয়া সন্ন্যাসী হইবে, হয় ত অপর্ণার কোন দারুণ দুর্দ্দিনের দিনে অকস্মাৎ কোথাও হইতে আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে। এমনি সম্ভব ও অসম্ভব কত রকম উত্তর প্রত্যুত্তর, বাদ প্রতিবাদ তাহার অপমান পীড়িত মস্তিষ্কের ভিতর অধীরতার সৃষ্টি করিতে লাগিল। ফলে কিন্তু সে তেমনি বসিয়া রহিল, এবং তেমনি কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার এই আগাগোড়া বিশৃঙ্খল সংকল্পের সুদীর্ঘ তালিকা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল না।

৮

তাহার পর দুই দিন দুই রাত্রি গত হইয়াছে, অমরনাথ ঘরে শুইতে আসে নাই। মা জানিতে পারিয়া বধূকে ডাকিয়া ঈষৎ ভৎ'সনা করিলেন, পুত্রকে ডাকাইয়া বুঝাইয়া বলিলেন; দিদি শাশুড়ি এই সূত্রে একটু রঙ্গ করিয়া লইলেন। এমনি সাতে পাঁচে ব্যাপারটা লঘু হইয়া গেল। রাত্রে অপর্ণা স্বামীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল, বলিল, "যদি মনে কষ্ট দিয়া থাকি ত আমাকে ক্ষমা কর।" অমরনাথ কথা কহিতে পারিল না। শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া, বিছানার চাদর বারবার টানিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিল। সম্মুখেই অপর্ণা দাঁড়াইয়া, মুখে তাহার ম্লান হাসি; সে আবার কহিল, "ক্ষমা করিবে না?" অমরনাথ মুখ নীচু করিয়াই বলিল, "ক্ষমা কিসের জন্য? ক্ষমা করিবার অধিকারই বা আমার কি?" অপর্ণা স্বামীর দুই হাত আপনার হাতের ভিতর লইয়া বলিল, "ওকথা বলিও না। তুমি স্বামী, তুমি রাগ করিয়া থাকিলে কি আমার চলে? তুমি ক্ষমা না করিলে আমি দাঁড়াইব কোথায়? কেন রাগ করিয়াছ, বল।" অমরনাথ আর্দ্র হইয়া কহিল, "রাগ ত করি নাই।"

"কর নাই ত?"

"না।" অপর্ণা কলহ ভাল বাসিত না; বিশ্বাস না করিয়াও বিশ্বাস করিল। কহিল, "তাই ভাল।" তাহার পর নিতান্ত নির্ভাবনায় বিছানার এক প্রান্তে শুইয়া পড়িল।

অমরনাথ কিন্তু ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কেবলই সে মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল যে, এ কথা তাহার স্ত্রী বিশ্বাস করিল কি করিয়া! সে যে দুদিন আসে নাই, দেখা করে নাই, তথাপি সে রাগ

করে নাই এটা কি বিশ্বাস করিবার কথা? এত কাণ্ড এত শীঘ্র মিটিয়া গিয়া সব বৃথা হইয়া গেল? তাহার পর যখন সে বুঝিতে পারিল অপর্ণা সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন সে একেবারে উঠিয়া বসিল; এবং দ্বিধাশূন্য হইয়া জোর করিয়া ডাকিয়া ফেলিল,—"অপর্ণা তুমি বুঝি ঘুমাইতেছ?—ও অপর্ণা!"

অপর্ণা জাগিয়া উঠিল, বলিল, "ডাকিতেছ?"

"হাঁ—কাল আমি কলিকাতায় যাইব।"

"কৈ, সে কথা ত আগে শুনি নাই! এত শীঘ্র তোমার কলেজের ছুটি ফুরাইল? আরো দু'দিন থাকিতে পার না?"

"না, আর থাকা হয় না।" অপর্ণা একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়া যাইতেছ?" ইহা যে সত্য কথা অমরনাথ তাহা জানিত, কিন্তু সে কথা সে স্বীকার করিতে পারিল না। সঙ্কোচ আসিয়া তাহার যেন কোঁচার খুঁট ধরিয়া টানিয়া ফিরাইল। আশঙ্কা হইল পাছে সে আপনার অপদার্থতা প্রতিপন্ন করিয়া অপর্ণার সম্ভ্রম হানি করিয়া বসে;—এমনি করিয়া এই কৌতূহল-বিমুখ নারীর নিশ্চেষ্টতা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। স্বামীত্বের যেটুকু তেজ সে তাহার স্বাভাবিক অধিকার হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, সে সবটুকু এই চার পাঁচ মাস ধরিয়া দিনে দিনে অপর্ণা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে, এখন সে ক্রোধ প্রকাশ করিবে কোন্ সাহসে? অপর্ণা আবার বলিল, "রাগ করিয়া কোথাও যাইয়ো না। তাহা হইলে আমার মনে বড় ব্যথা লাগিবে।" অমরনাথ মিথ্যা:ও সত্যে যাহা বানাইয়া বলিতে পারিল তাহার অর্থ এই যে, সে রাগ করে নাই, এবং তাহারই প্রমাণস্বরূপ সে আরো দুইদিন থাকিয়া যাইবে। থাকিলেও

তাই। কিন্তু কাঁদিয়া জয়ী হইবার একটা লজ্জাজনক অস্বস্তি লইয়াই বাড়ীতে থাকিল।

৯

ঝাড়া বৃষ্টির একটা সুবিধা আছে,—তাহাতে আকাশ নির্ম্মল হয়। কিন্তু টিপি টিপি বৃষ্টিতে মেঘ কাটে না, শুধু পায়ের নীচে কাদা ও চতুর্দ্দিকে নিরানন্দময় ভাব বাড়িয়া উঠে। বাড়ী হইতে যে কাদা মাখিয়া অমরনাথ কলিকাতায় আসিল, তাহা ধুইয়া ফেলিবার একটুখানি জলও সে এই বৃহৎ নগরীর ভিতর খুঁজিয়া পাইল না। এখানে তাহার পূর্ব্বপরিচিত যে সব সুখ ছিল, তাহাদের কাছে এই পঙ্কিল পা দুখানি বাহির করিতেও তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। না লাগে লেখাপড়ায় মন, না পায় আমোদ আহ্লাদে তৃপ্তি। এখানেও থাকিতে ইচ্ছা করে না, বাড়ী যাইতেও প্রবৃত্তি নাই। সমস্ত বুকের উপর তাহার যেন দুর্ব্বহ যন্ত্রণাভার চাপানো রহিয়াছে, এবং তাহা ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য ব্যাকুল বক্ষপঞ্জর পরস্পর ঠোকাঠুকি করিতেছে, কিন্তু বিফল চেষ্টা!

এমনি অন্তর্ব্বেদনা লইয়া সে একদিন অসুখে পড়িল। সংবাদ পাইয়া পিতামাতা ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু অপর্ণাকে সঙ্গে আনিলেন না। অমরনাথও যে ঠিক এমনটি আশা করিয়াছিল তাহা নয়, তবু দমিয়া গেল। অসুখ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এসময় স্বভাবতঃই তাহার অপর্ণাকে দেখিতে ইচ্ছা করিত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিতে পারিল না, পিতামাতাও তাহা বুঝিলেন না। কেবল ঔষধ পথ্য আর ডাক্তার বৈদ্য! অবশেষে সে তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল—অমরনাথ একদিন প্রাণত্যাগ করিল।

বিধবা হইয়া অপর্ণা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়া একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা তাহার মনে হইল, এ বুঝি তাহারই কামনার ফল! ইহাই বুঝি সে মনে মনে এতদিন চাহিতেছিল—অন্তর্যামী এতদিনে কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। বাহিরে শুনিতে পাইল যে তাহার বৃদ্ধ পিতা চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছেন। এ কি সব স্বপ্ন? তিনি আসিলেন কখন? অপর্ণা জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সত্য সত্যই রাজনারাণ বাবু বালকের মত ধূলায় লুটিয়া কাঁদিতেছেন। পিতার দেখাদেখি সেও এবার ঘরের ভিতর লুটিয়া পড়িল; অশ্রু-প্রবাহ মাটী ভিজাইয়া ফেলিল।

সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই; পিতা আসিয়া অপর্ণাকে বুকে তুলিয়া বলিলেন,—"মা! অপর্ণা!"

অপর্ণা কাঁদিয়া বলিল, "বাবা।"

"মোর মদন-মোহন যে তোকে মন্দিরে ডেকেছে মা!"

"চল বাবা যাই।"

"তোর যে সেখানে সব কাজ প'ড়ে আছে মা!"

"চল বাবা, বাড়ী যাই।"

"চল মা চল।" পিতা স্নেহে মস্তক চুম্বন করিলেন, বুক দিয়া সর্ব্বদুঃখ মুছিয়া লইলেন, এবং তাহার পর কন্যার হাত ধরিয়া পরদিন বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া কহিলেন, "ঐ মা তোমার মন্দির! ঐ তোমার মদন-মোহন!" নিরাভরণা অপর্ণার বৈধব্য-বেশে তাহাকে আর এক রকম দেখিতে হইল। যেন এই সাদা বস্ত্র ও রুক্ষ কেশে তাহাকে অধিক মানাইল। সে তাহার পিতার কথা ভারি বিশ্বাস করিল, ভাবিল দেবতার আহ্বানেই সে ফিরিয়া আসিয়াছে। ঠাকুরের মুখে যেন

তাই হাসি, মন্দিরে যেন তাই শতগুণ সৌরভ! নিজে যেন সে এ পৃথিবীর অনেক উচ্চে এইরূপ মনে হইল!

যে স্বামী নিজের মরণ দিয়া তাহাকে পৃথিবীর এত উচ্চে রাখিয়া গিয়াছেন, সেই মৃত স্বামীর উদ্দেশে শতবার প্রণাম করিয়া অপর্ণা তাঁহার অক্ষয় স্বর্গ কামনা করিল।

১০

শক্তিনাথ একমনে ঠাকুর গড়িতেছিল। পূজা করার চেয়ে, ঠাকুর তৈরি করিতে সে অধিক ভালবাসিত। কেমন রূপ, কেমন নাক, কান, চোখ হইবে, কোন্ রং বেশী মানাইবে, এই তাহার আলোচ্য বিষয়। কি দিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয়, কি মন্ত্রে জপ করিতে হয়, এ সব ছোট বিষয়ে তাহার লক্ষ্য ছিল না। দেবতার সম্পর্কে সে আপনাকে আপনি প্রোমোশন দিয়া, সেবকের স্থান হইতে পিতার স্থানে উঠিয়া বসিয়াছিল। তবু, তাহার পিতা তাকে আদেশ করিলেন, "শক্তিনাথ, আজ আমার জ্বর বাড়িয়াছে, জমিদার বাটিতে গিয়া তুমি পূজা করিয়া এস।" শক্তিনাথ বলিল, "এখন ঠাকুর গড়িতেছি—" বৃদ্ধ অসমর্থ পিতা রাগ করিয়া বলিলেন, "ছেলেখেলা এখন থাক্ বাবা, কাজ সেরে এস।" পূজার মন্ত্র আবৃত্তি করিতে তাহার মোটে ইচ্ছা হইত না—তবু উঠিতে হইল। পিতার আদেশে স্নান করিয়া, চাদর ও গামছা কাঁদে ফেলিয়া দেব মন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহার পূর্ব্বেও সে কয়েকবার এ মন্দিরে পূজা করিতে আসিয়াছে কিন্তু এমন কাণ্ড কখন দেখে নাই। এত পুষ্পগন্ধ, এত ধূপ ধূনার আড়ম্বর, ভোজ্য ও নৈবেদ্যের এত বাহুল্য! তার ভারি ভাবনা হইল এত লইয়া সে কি করিবে? কিরূপে কাহার পূজা করিবে? সকলের চেয়ে সে অপর্ণাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এ কে,

কোথা হইতে আসিয়াছে, এত দিন কোথায় ছিল? অপর্ণা কহিল, "তুমি কি ভট্টাচার্য্য মশা'য়ের ছেলে?" শক্তিনাথ বলিল, "হাঁ," "তবে, পা' ধুইয়া পূজা করিতে ব'স।" পূজা করিতে বসিয়া শক্তিনাথ আগাগোড়া ভুলিয়া গেল। একটা মন্ত্রও তাহার মনে পড়ে না। সেদিকে তাহার মনও নাই, বিশ্বাসও নাই,—শুধু ভাবিতে লাগিল, "এ কে, কেন এত রূপ, কিজন্য বসিয়া আছে" ইত্যাদি। পূজার পদ্ধতি ওলট পালট হইতে লাগিল। কখনো ঘণ্টা বাজাইয়া, কখনো ফুল ফেলিয়া, কখনো নৈবেদ্যের উপর জল ছিটাইয়া এই অজ্ঞ নূতন পুরোহিতটী যে পূজার কেবল ভাণ করিতেছে মাত্র, বিজ্ঞ পরীক্ষকের মত পিছনে বসিয়া অপর্ণা সব বুঝিল। চিরদিন দেখিয়া দেখিয়া এ সব সে ভাল করিয়াই জানে, শক্তিনাথ তাহাকে ফাঁকি দিবে কি করিয়া? পূজাবসানে, কঠিন স্বরে অপর্ণা কহিল; "তুমি বামনের ছেলে, অথচ পূজা করিতে জান না!" শক্তিনাথ বলিল, "জানি।" "ছাই জান!" শক্তিনাথ বিহ্বলের মত একবার তাহার মুখপানে চাহিল, তাহার পর চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। অপর্ণা ডাকিয়া ফিরাইল, বলিল, "ঠাকুর, এ সব বাঁধিয়া লইয়া যাও—কিন্তু কাল আর আসিয়োনা। তোমার পিতা আরোগ্য হইলে তিনি আসিবেন।" অপর্ণা নিজেই তাহার চাদর ও গামছায় সমস্ত বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে বিদায় করিল। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া শক্তিনাথ বার বার শিহরিয়া উঠিল।

এদিকে অপর্ণা নূতন করিয়া পূজার আয়োজন করিয়া অন্য ব্রাহ্মণ ডাকিয়া পূজা শেষ করিল।

১১

একমাস গত হইয়াছে। আচার্য্য যদুনাথ, জমিদার

রাজনারাণ বাবুকে বুঝাইয়া বলিতেছেন,—"আপনি ত সমস্তই জানেন; বড় মন্দিরের এই বৃহৎ পূজা মধু ভট্টাচার্য্যের ছেলেটার দ্বারা কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারে না।" রাজনারাণ বাবু সায় দিয়া বলিলেন, "অনেক দিন হইল অপর্ণাও ঠিক এই কথাই বলিয়াছিল।" আচার্য্য মুখমণ্ডল আরো গম্ভীর করিয়া কহিলেন "তা'ত হবেই। তিনি হ'লেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা! তাঁব কি কিছু অগোচর আছে!" জমিদার বাবুরও ঠিক এই বিশ্বাস! আচার্য্য কহিতে লাগিলেন "পূজা আমিই করি আর যেই করুন, ভাল লোক চাই! মধু ভট্টাচার্য্য যতদিন বাঁচিয়াছিলেন তিনিই পূজা করিয়াছিলেন এখন তাঁহার পুত্রেরই পৌরোহিত্য করা উচিত, কিন্তু সেটা ত মানুষ নয়! কেবল পট আঁকিতে পারে, পুতুল গড়িতে জানে, পূজা অর্চ্চনার কিছুই জানে না।" রাজনারাণ বাবু অনুমতি দিলেন, "পূজা আপনি করিবেন, তবে অপর্ণাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব।" পিতার নিকট একথা শুনিয়া অপর্ণা মাথা নাড়িল, বলিল "তাও কি হয়? বামুনের ছেলে নিরাশ্রয়, কোথায় তাহাকে বিদায় করিব? যেমন জানে তেমনই পূজা করিবে। ঠাকুর তাতেই সন্তুষ্ট হইবেন।" কন্যার কথায় পিতার চৈতন্য হইল; "এতটা আমি ভাবিয়া দেখি নাই। মা, তোমার মন্দির, তোমার পূজা, তোমার যা ইচ্ছা তাই করিয়ো, যাহাকে ইচ্ছা ভার দিয়ো।" এই কথা বলিয়া পিতা প্রস্থান করিলেন। অপর্ণা শক্তিনাথকে ডাকিয়া আনিয়া পূজার ভার দিল। বকুনি খাইয়া অবধি সে আর এ দিকে আসে নাই, মধ্যে তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে; সে নিজেও রুগ্ন। শুষ্ক মুখে তাহার শোকদুঃখের চিহ্ন দেখিয়া অপর্ণার মায়া হইল, কহিল, "তুমি পূজা

করিয়ো; যাহা জান তাই করিয়ো, তাতেই ঠাকুরের তৃপ্তি হইবে।" এমন স্নেহের স্বর শুনিয়া তাহার সাহস হইল, সাবধান হইয়া মন দিয়া পূজা করিতে বসিল। পূজা শেষ হইলে অপর্ণা নিজের হাতে, সে যাহা খাইতে পারে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, "বেশ পূজা করিয়াছ। বামন ঠাকুর, তুমি কি নিজের হাতে রাঁধিয়া খাও!"

"কোন দিন রাঁধি, কোন দিন, যে দিন জ্বর হয়, সে দিন আর রাঁধিতে পারি না।"

"তোমার কি কেউ নাই?"

"না।" শক্তিনাথ চলিয়া গেলে, অপর্ণা তাহার উদ্দেশে বলিল, "আহা!" দেবতার কাছে নতকরে তাহার হইয়া প্রার্থনা করিল, "ঠাকুর, ইহার পূজায় তুমি সন্তুষ্ট হইয়ো, ছেলেমানুষের দোষ অপরাধ লইও না।" সেই দিন হইতে প্রতিদিন অপর্ণা দাসী দ্বারা সংবাদ লইত, সে কি খায়, কি করে, কি তাহার প্রয়োজন। নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ কুমারটিকে সে তাহার অজ্ঞাতসারে আশ্রয় দিয়া তাহার সমস্ত ভার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইল। এবং সেই দিন হইতে এই কিশোর ও কিশোরী, তাহাদের ভক্তি-স্নেহ ভুল-ভ্রান্তি সব এক করিয়া এই মন্দিরটিকে আশ্রয় পূর্ব্বক জীবনের বাকী কাজগুলিকে পর করিয়া দিল। শক্তিনাথ পূজা করে, অপর্ণা দেখাইয়া দেয়। শক্তিনাথ স্তব পাঠ করে, অপর্ণা মনে মনে তাহার সহজ অর্থ দেবতাকে বুঝাইয়া দেয়। শক্তিনাথ গন্ধপুষ্প হাত দিয়া তুলিয়া লয়, অপর্ণা অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলে, "বামুন ঠাকুর আজ এমনি করিয়া সিংহাসন সাজাও দেখি, বেশ দেখাইবে।" এমনি করিয়া এই বৃহৎ মন্দিরের বৃহৎ কাজ চলিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন, "ছেলেখেলা হইতেছে।" বৃদ্ধ রাজনারাণ

বলিলেন, "যা করিয়া হোক্ মেয়েটা নিজের অবস্থা ভুলিয়া থাকিলেই বাঁচি।"

১২

থিয়েটারের ষ্টেজে যেমন পাহাড় পর্ব্বত, ঝড় জল এক নিমিষে উড়িয়া গিয়া একটা মস্ত রাজ প্রাসাদ কোথা হইতে আসিয়া জোটে, আর লোকজনের, সুখসম্পদের মাঝে, দুঃখ দৈন্যের চিহ্ন বিলুপ্ত হয়; শক্তিনাথের জীবনেও যেন সেইরূপ হইয়াছে। সে জাগিয়াছিল, এখন ঘুমাইয়া সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছে, কিম্বা নিদ্রায় দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল, এখন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছে, প্রথমে তাহার তাহা ভাল ঠাহর হইত না। তথাপি, এই দায়িত্বহীন দেব-সেবার সুবর্ণ শৃঙ্খল যে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিয়াছে, এবং থাকিয়া থাকিয়া ঝম্ ঝম্ শব্দে বাজিয়া উঠিতেছে, ঐ ... সুপ্ত পুতুলগুলা মাঝে মাঝে সে কথা তাহাকে স্মরণ করাইত; সে মৃত পিতার কথা মনে করিত, নিজের পূর্ব্ব স্বাধীনতার কথা ভাবিত; মনে হইত সে যেন বিকাইয়া গিয়াছে, অপর্ণা তাহাকে কিনিয়াছে। অম্‌নি অপর্ণার স্নেহ ক্রমে মোহের মত তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

অকস্মাৎ একদিন শক্তিনাথের মামাত ভাই আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার ভগিনীর বিবাহ। মামা কলিকাতায় থাকেন, সময় ভাল, কাজেই সুখের দিনে ভাগিনেয়কে মনে পড়িয়াছে। যাইতে হইবে। কলিকাতা যাইতে হইবে কথাটা শক্তিনাথের খুব ভাল লাগিল; সমস্ত রাত্রি সে দাদার নিকট বসিয়া কলিকাতার সুখের গল্প, শোভার কাহিনী, সমৃদ্ধির বিবরণ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। পরদিন, মন্দিরে যাইতে তাহার ইচ্ছা হইল না। বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া অপর্ণা ডাকিয়া পাঠাইল; শক্তিনাথ গিয়া বলিল, "আজ

আমি কলিকাতায় যাইব—মামা ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।” বলিয়াই সে একটু সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল। অপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল, “কবে ফিরিয়া আসিবে?” শক্তিনাথ ভয়ে ভয়ে বলিল, “মামা আসিতে বলিলেই চলিয়া আসিব।” অপর্ণা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। আবার সেই যদু আচার্য্য আসিয়া পূজা করিতে বসিল। আবার তেমনি করিয়া অপর্ণা পূজা দেখিতে লাগিল, কিন্তু কোন কথা বলিবার আর তাহার প্রয়োজনও হইল না, ইচ্ছাও ছিল না।

কলিকাতায় আসিয়া বিবিধ বৈচিত্র্যে শক্তিনাথের বেশ দিন কাটিলেও কয়েক দিন পরেই বাড়ীর জন্য তাহার মন কেমন করিতে লাগিল। সুদীর্ঘ অলস দিনগুলা আর যেন কাটিতে চাহেনা! রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, অপর্ণা যেন তাহাকে ক্রমাগত ডাকিতেছে, আর উত্তর না পাইয়া রাগ করিতেছে। একদিন সে মামাকে কহিল, “আমি বাড়ী যাইব।” মামা নিষেধ করিলেন, সে জঙ্গলে গিয়া আর কি হইবে? এই খানে থাকিয়া লেখাপড়া কর, আমি তোমার চাকরি করিয়া দিব।” শক্তিনাথ মাথা নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল। মামা কহিলেন, “তবে যাও।” বড় বৌ শক্তিনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, “ঠাকুর পো, কাল বুঝি বাড়ী যাবে?” শক্তিনাথ বলিল “হাঁ, যাব।” “অপর্ণার জন্য মন কেমন কচ্চে না কি?” শক্তিনাথ বলিল “হাঁ।” “সে তোমাকে খুব যত্ন করে, নয়?” শক্তিনাথ মাথা নাড়িয়া কহিল “খুব যত্ন করে।” বড় বৌ মুখ টিপিয়া হাসিলেন; তিনি অপর্ণার কথা পূর্ব্বেই শক্তিনাথের নিকট শুনিয়া লইয়াছিলেন, বলিলেন, “তবে ঠাকুরপো, এই দুটি জিনিস লইয়া যাও; তাহাকে দিয়ো, সে আরো ভাল বাসিবে।”

বলিয়া তিনি একটা শিশির ছিপি খুলিয়া খানিকটা 'দেলখোস' শক্তিনাথের গায়ে ছড়াইয়া দিলেন। গন্ধে শক্তিনাথ পুলকিত হইয়া শিশি দুটি চাদরে বাঁধিয়া লইয়া পরদিন বাটী ফিরিয়া আসিল।

১৩

শক্তিনাথ মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে, পূজা শেষ হইয়াছে। চাদরে, সেই শিশি দুটী বাঁধা আছে—কিন্তু দিতে সাহস হইতেছে না,—এই কয়দিনে অপর্ণা তাহার নিকট হইতে এতই দূরে সরিয়া গিয়াছে। মুখ ফুটিয়া কিছুতে বলিতে পারিল না "তোমার জন্য সাধ করিয়া কলিকাতা হইতে ইহা আনিয়াছি। সুগন্ধে তোমার দেবতা তৃপ্ত হন, তাই তুমিও হইবে।" এইভাবে সাত আট দিন কাটিল; নিত্য সে চাদরে বাঁধিয়া শিশিদুটা লইয়া আসে, নিত্য ফিরাইয়া লইয়া যায়, আবার যত্ন করিয়া পরদিনের জন্য তুলিয়া রাখে। পূর্ব্বেরমত একদিনও যদি অপর্ণা তাহাকে ডাকিয়া একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে হয়ত সে তাহাকে তাহা দিয়া ফেলিত, কিন্তু এ সুযোগ আর কিছুতেই হইল না। আজ দুই দিন হইতে তাহার জ্বর হইতেছে, তবু ভয়ে ভয়ে সে মন্দিরে পূজা করিতে আসে। কি একটা অজানা আশঙ্কায় সে পীড়ার কথাটাও বলিতে পারে না। অপর্ণা কিন্তু সম্বাদ লইয়া জানিল যে দুইদিন হইতে শক্তিনাথ কিছুই খায় নাই, অথচ পূজা করিতে আসিতেছে! অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, তুমি দু'দিন হ'তে কিছু খাওনাই কেন?" শক্তিনাথ শুষ্কমুখে কহিল, "আমার রাত্রে রোজ জ্বর হয়।"

"জ্বর হয়? তবে স্নান করিয়া পূজা করিতে এস কেন? একথা বল নাই কেন?" শক্তিনাথের চোখে জল আসিল।

মুহূর্ত্তে সব কথা ভুলিয়া গিয়া সে চাদর খুলিয়া শিশি দুইটি বাহির করিয়া বলিল, "তোমার জন্য এনেছি।"

"আমার জন্য ?"

"হাঁ—তুমি গন্ধ ভালবাস না ?"—উষ্ণ দুধ যেমন একটু খানি আগুণের তাপ পাইবামাত্র টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠে, অপর্ণার সর্ব্বাঙ্গের রক্ত তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিল ;—শিশি দুইটি দেখিয়াই সে চিনিয়াছিল ; গম্ভীর স্বরে বলিল "দাও—" হাতে লইয়া অপর্ণা, মন্দিরের বাহিরে যেখানে পূজা করা ফুল শুকাইয়া পড়িয়াছিল,—সেই খানে শিশিদুটি নিক্ষেপ করিল। আতঙ্কে শক্তিনাথের বুকের রক্ত জমাট বাঁধিয়া গেল। কঠিন স্বরে অপর্ণা কহিল, "বামুন ঠাকুর, তোমার মনে মনে এত। আর তুমি আমার সামনে এসো না, মন্দিরের ত্রিসীমায়াও মাড়িয়োনা।" অপর্ণা চম্পকাঙ্গুলি দিয়া বহির্দ্দেশ দেখাইয়া বলিল, "যাও—"

আজ তিন দিন হইল শক্তিনাথ গিয়াছে। আবার যদু আচার্য্য পূজা করিতে বসিয়াছেন আবার ম্লান মুখে অপর্ণা চাহিয়া দেখিতেছে, এ যেন কাহার পূজা কে আসিয়া শেষ করিতেছে! পূজা সাঙ্গ করিয়া নৈবেদ্যের রাশি গামছায় বাঁধিতে বাঁধিতে আচার্য্য মহাশয় নিশ্বাস ফেলিয়া "ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মারা গেল!" আচার্য্যের মুখপানে চাহিয়া অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "কে মারা গেল ?"

"তুমি বুঝি শোন নাই ? কয়দিনের জ্বরে শক্তিনাথ, ঐ মধু ভট্টাচার্য্যের ছেলে, আজ সকাল বেলা মারা পড়িয়াছে।" অপর্ণা তবু তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। আচার্য্য দ্বারের বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "পাপের ফলে আজকাল অকাল মৃত্যু হইতেছে, দেবতার সঙ্গে কি তামাসা চলে মা!"

আচার্য্য চলিয়া গেলেন। অপর্ণা দ্বার রুদ্ধ করিয়া

মাটীতে মাথা ঠুকিয়া কাঁদিতে লাগিল, সহস্রবার কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"ঠাকুর এ কাহার পাপে?"

বহুক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিল, চোখ মুছিয়া সে সেই শুষ্ক ফুলের ভিতর হইতে স্নেহের দান মাথায় করিয়া তুলিয়া লইল। মন্দিরের ভিতর আবার প্রবেশ করিয়া দেবতার পায়ের কাছে তাহা নামাইয়া দিয়া কাঁদিয়া কহিল, "ঠাকুর, আমি যাহা লইতে পারি নাই—তাহা তুমি লও। নিজের হাতে আমি কখন তোমার পূজা করি নাই, আজ করিতেছি, —তুমি গ্রহণ কর, তৃপ্ত হও, আমার অন্য কামনা নাই।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,
বাঙ্গালিটোলা, ভাগলপুর।

অষ্টম বৎসরের প্রথম পুরস্কার।

সন্ন্যাস।

১

আমার ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, এবং তাহার পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ ইঁচড়ে পাকিয়া গিয়াছিলাম। বিবাহের পূর্ব্বে যখন দাদা পঠদ্দশায় বিবাহ করা উচিত নয় বলিয়া একটু আপত্তি তুলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, তখন সম্মুখে গলদশ্রুলোচনা পিসীমাকে অবস্থিত দেখিয়া অগত্যা তাঁহাকে সম্ভাবিত আপত্তির প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে হইয়াছিল।

পিসীমা বলিলেন, "ও কি আমার অদৃষ্টে বাঁচ্‌বে? তাতে আবার ওর লেখাপড়ার জন্য এত শাসন! এ বিয়েতে অমত করো না বাবা; মেয়েটি সুন্দরী, বিয়েটা হলে আমিও নরুর ছেলে মেয়ের মুখ দেখে সুখে মরতে পারি।"

অতএব পিসীমার এই কথায় প্রতিপন্ন হইল পিসীমার অদৃষ্ট অতিশয় মন্দ, এবং তাঁহার অদৃষ্টের দোষেই আমার বাঁচিবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। যখন বাঁচিবার সম্ভাবনা অল্প তখন লেখাপড়া নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়, এবং বিবাহটা একান্ত অপ্রয়োজনীয়, বিশেষ যখন মেয়েটি সুন্দরী। এ পর্য্যন্ত বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল; কিন্তু আমার ছেলে

মেয়ের মুখ দেখিয়া মরা পিসীমার পক্ষে এত সুখকর কেন, সেইটিই বুঝিতে আমার কিছু গোলমাল ঠেকিতেছিল।

যাহা হউক, দাদা এই সকল অমোঘ যুক্তির বিরুদ্ধে আর কোনও আপত্তি উত্থাপনের সাহস করিলেন না। অতএব নির্ব্বিঘ্নে সুষমার সহিত আমার উদ্বাহ-বন্ধন সুসম্পন্ন হইল।

কিন্তু এ হেন পিসীমার বর্ত্তমানেও যে জীবনটা নিরবচ্ছিন্ন সুখের নয় তাহা পরে জানিয়াছিলাম।

২

আমার বৌদিদির অনেক দোষ ছিল। প্রথম দোষ তিনি সর্ব্বদাই হাস্যমুখী, তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেই বোধ হইত তিনি হাসিতেছেন। মেয়ে মানুষের এত হাসি কেন? পিসীমার দিকে চাহিয়া দেখ দেখি তিনি কত গম্ভীর! তা ছাড়া বৌদিদির অন্যান্য দোষেরও সীমা ছিল না; বৌদিদির দোষেই পিসীমা অন্যমনস্ক হইয়া পা দিয়া দুধের বাটি প্রভৃতি ফেলিয়া দিতেন, হাত হইতে তেলের ভাঁড় পড়িয়া যাইত, পিসীমা দুধ জ্বাল দিতে গেলেই বৌদিদির দোষে কড়ার সমস্ত দুধ উথলাইয়া পড়িত। মানুষের শরীরে আর কত সহ্য হয়? কাযেই এ সমস্ত ঘটনা ঘটিলে পিসীমা বৌদিদিকে তিরস্কার করিতেন; তা বৌ ঝির দোষ দেখিলে শাসন না করিলে কি চলে? তাহাতেই পাড়ার দগ্ধাননীরা পিসীমাকে বৌকাঁটকি বলিত। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি পিসীমা যখন শাসন করিতেন, বৌদিদি তখন তাঁর সম্মুখে ঘাড় হেঁট করিয়া ভিজে বেড়ালটির মত দাঁড়াইয়া থাকিতেন (এ উপমাটি পিসীমা প্রদত্ত)। তখনও তাঁহার মুখ তেমনি হাস্যময় দেখিতাম। বৌদিদির সর্ব্বাপেক্ষা দোষ, তিনি আমার উপর সর্ব্বদা গুরুগিরি করিতেন। আমি

তাঁর চেয়ে দু'এক বছরের ছোট হইলেও হইতে পারি, তাই বলিয়া মেয়ে মানুষের কাছে উপদেশ লইতে হইবে নাকি? একে বৌদিদির উপদেশ, তারপর আবার দাদার বকুনি! কথা বলিতে তো খরচ লাগে না, কাজেই দাদা অনর্গল বকিয়া যাইতেন। (এ কথায় যেন কেহ মনে না করেন—দাদা কৃপণ)।

দাদার সেই সমস্ত বাক্যব্যয়ের ফলে আমি সে দিন দাদার কিছু খরচ বাঁচাইতাম, অর্থাৎ খাইতাম না, সুতরাং পিসীমাও অনাহারে থাকিতেন, অগত্যা বৌদিদি বেচারিরও খাওয়া হইত না—দেখিয়া শুনিয়া সংসারে আমার নিতান্ত বিরাগ উপস্থিত হইল।

তখন পিসীমা বৌদিদিকে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁগা বৌমা! তোমাদের কেমন আক্কেল বল দেখি?" বৌদিদি শঙ্কিত হইয়া উত্তর করিলেন, "কি হয়েছে পিসীমা?" "হবে আবার কি? চোখে কি কিছু দেখ্‌তে পাও না? নরু আমার দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্চে। বে দিলে, তা বৌ কি আন্‌বে না? আজ যদি তোমার শাশুড়ী থাক্‌তো তো দেখ্‌তে পেতে নরুর বৌয়ের কত আদর! আহা, নরু আমার বাঁচবে তার আবার বৌ হবে একথা স্বপনের অতীত।" শেষ কথার সঙ্গে পিসীমার চক্ষে অশ্রুর আবির্ভাব হইল।

বৌদিদি ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "আমি তো পিসীমা আন্‌বার কথা বলেছিলাম; তা ঠাকুরপোর পরীক্ষাটা হয়ে গেলে—"

"পরীক্ষে তো সেই ফাল্গুন মাসে! তা বলে তদ্দিন ঘরের বউ ঘরে আন্‌বে না?"

দিন দেখিয়া ২।৩ দিন পরে সুষমাকে বাড়ী আনা হইল।

লোকে বলিত, "আহা দুটি জায়ে কেমন ভাব, যেন মায়ের পেটের বোনের মত দুটিতে আছে।"

কিন্তু পিসীমা সর্ব্বদাই বলিতেন, "ওর শাশুড়ী নেই, ওকে আর কে যত্ন করবে? বউ? বউত কেবল রাত দিন খাটিয়েই নিতে পারে, তা না করে খাওয়ার যত্ন, না করে মাথ্‌বার যত্ন।"

বৌদিদি শুনিয়া হাসিতেন। সুষমা কি ভাবিত জানি না; কিন্তু দেখিতাম সে রোজ বিকালে পিসীমার মাথার পাকাচুল তুলিয়া দিত, এবং রাত্রে তাঁহার পায়ে তেল মাখাইত; সন্ধ্যাবেলায় বৌদিদি যখন রাঁধিতেন তখন তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিত। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইত সুষমা নিতান্ত বোকা বার বৎসব বয়সেও তাহার এ জ্ঞানটুকু হইল না যে, অমূল্য জীবনটা পাকাচুল তুলিয়া, পায়ে তেল ঘসিয়া ও রান্নাঘরে গল্প করিয়া কাটাইবার জন্য নহে। তবে, বৌদিদির বুদ্ধির পরিচয়ও কিঞ্চিৎ পাইয়াছিলাম; শনি ও রবিবারে দুপুর বেলায় যখন সুষমা খোকাকে লইয়া আদর করিতে মহা ব্যস্ত থাকিত, তখন বৌদিদি তাহাকে টানিয়া আনিয়া আমার ঘরের দুয়ার পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া যাইতেন। ইহাতে পিসীমাও কথঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন, "বড় বৌমার ত বেশ বুদ্ধি শুদ্ধি আছে!"

আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, একে ত স্ত্রীলোকমাত্রেই বোকা, তার উপর সুষমা আবার বিষম বোকা; আমার মত ব্যক্তির জীবনের সহচরী হইবার জন্য উহার কিঞ্চিৎ জ্ঞানবৃদ্ধির প্রয়োজন। অতএব দোকানে গিয়া একখানি দ্বিতীয় ভাগ ও একখানি কথামালা কিনিয়া আনিলাম।

কিন্তু ক্রমশঃ বোধ হইতে লাগিল, সুষমা নিতান্ত বোকা নয়। খনির গর্ভে হীরকের ন্যায় উহার অভ্যন্তরে কিছু

জ্ঞানরত্ন আছে, একটু ঘসিয়া মাজিয়া লইতে পারিলেই হয়। তবে বৌদিদির সঙ্গে তাহার অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া আমার ভয় হইত সেও বা বৌদিদির নিকট হইতে গুরুগিরি বিদ্যাটা শিখিয়া ফেলে! আমি মাথায় লম্বা চুল রাখিয়াছিলাম সে গুলি কাটিয়া ফেলিলাম, এবং খুব উৎসাহের সঙ্গে সুষমাকে রাত্রে ও মধ্যাহ্নে পড়াইতে আরম্ভ করিলাম, এদিকে আমার পরীক্ষার সময়ও ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

৩

সে দিন বৌদিদি সুষমাকে লইয়া কাহাদের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছেন, দাদা আফিসে গিয়াছেন, ছেলেদের গোলমাল নাই, বাড়ী নিস্তব্ধ, বাহিরের ঘরে ক্ষুদিরাম চাকর নাক ডাকাইতেছে, পিসীমার ঘরে পিসীমা মালা হাতে করিয়া ঢুলিতেছেন, এবং আমার ঘরে আমি কলেজ-পলাতকরূপে নীরবে খাটের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আছি, আর আমার সম্মুখে সুষমার কথামালা ও মানে লেখার খাতাখানি সুষমার বিরহে কালীর দাগ গায়ে মাখিয়া মলিন ভাবে পড়িয়া আছে। জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, "সজল নিবিড় ঘন, সরস বরষা।" বৃষ্টি বিন্দুগুলি আকাশ হইতে ঝরিয়া পাতায় পাতায় পড়িতেছে, আবার পাতা হইতে ঝরিয়া কর্দ্দমাক্ত ভূমিতে পড়িতেছে,--তাহাই অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলাম। তাহার পর সুষমার বই ও খাতাখানির দিকে দৃষ্টি পড়িল। ছাত্রী অনুপস্থিতা, কি আর করি? মানের খাতা খানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া মনে মনে নিজের শিক্ষকতার প্রশংসা করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে দেখিলাম মানের খাতার এক কোণে ছোট ছোট অক্ষরে কি লেখা আছে। পাঠ্য পুস্তকে

বাজে কথা লেখা অন্যায় ; এ বিষয়ে সুসমাকে শিক্ষা দিয়াছি, তথাপি ছাত্রীর এইরূপ অবাধ্যতা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। লেখাটি পড়িয়া দেখিলাম, "এই বুঝি তোমার কুন্তলীন কিনে দেওয়া ? আমি ত এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয়ভাগ শেষ করেছি।" অবশ্য যে শিক্ষক পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া পরিশেষে পুরস্কার প্রদানের কথা বিস্মৃত হন তিনি দোষী বটে, এ কথা স্বীকার করি ; কিন্তু পাঠ্য পুস্তকে সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা কোন ছাত্রীরই কর্ত্তব্য নহে।

রাত্রে সুষমাকে বলিলাম, "কেমন নিমন্ত্রণ খাইলে ?"

"কেমন আবার ?"

"নিমন্ত্রণ খাইতে খাইতে এত দিন যাহা শিখিয়াছ তাহাও তো খাইয়া ফেল নাই। মানে লেখার খাতা খানি একবার নিয়ে এস দেখি !"

সুষমা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন ?"

"কেমন লিখিয়াছ দেখিব।"

সুষমা বলিল, "সে হারাইয়া গিয়াছে।" স্ত্রীলোকের নীতিজ্ঞান কি কম। স্বচ্ছন্দে মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিল।

প্রাতে উঠিয়াই বাজারের দিকে চলিলাম। আমার বাসস্থান মুঙ্গের, কাযেই কুন্তলীন কিনিবার জন্য একটু অনুসন্ধান করিতে হইল। বেলা ১২টার সময় বাড়ী ফিরিলাম। পিসীমা ভাবিয়াছিলেন, আমি গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছি ; কাযেই তিনি কাঁদিতেছিলেন, এবং সেটা কিছু অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু সেদিন যে মাসের শেষ শনিবার তাহা আমার স্মরণ ছিল না, কাযেই দাদাকে সম্মুখে দেখিয়া এবং তাঁহার গম্ভীর মুখ দেখিয়া আমার মত সাহসীরও হৃদয় বিচলিত হইল।

দাদা জলদ গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন, "নরেন !" বুঝিলাম

বড় সুবিধার কথা নহে। ভয়ে ভয়ে দাদার নিকটস্থ হইলাম ; ছেলেবেলার গুরুমহাশয়কে স্মরণ হইতে লাগিল, কিন্তু মনকে প্রবোধ দিলাম দাদা কখনই আমাকে বেত মারিবেন না।

আমি দাদাকে রাগ করিতে জীবনে দু'তিন বারের বেশী দেখি নাই ; আজ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম দাদা রাগ করিয়াছেন। রাগ করিলে দাদা অধিক কথা বলিতেন না, আজও বলিলেন না। দুই চারি কথার পর শেষে বলিলেন, "পরীক্ষা দিয়া যত দিন পাশ না হইতে পার, ততদিন আমার সম্মুখে আসিও না।"

প্রবেশিকাসাগর সন্তরণ দিয়া পার হওয়া আমার দুঃসাধ্য। কি করিব ভাবিতে ভাবিতে শেষে শয়নগৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম ; তখন সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। সুষমা উবুড় হইয়া বালিসে মুখ লুকাইয়া শুইয়াছিল। আমি ভাবিলাম বোধ হয় তাহার জ্বর হইয়াছে, নতুবা সে এ অসময়ে শুইয়া থাকিবে কেন ?

সুষমাকে ডাকিয়া বলিলাম, "সুষমা উঠ, তোমার জন্য কি এনেছি দেখ।" সুষমা উঠিয়া বসিল। তাহার চোক মুখ লাল হইয়াছে, সম্ভবতঃ জ্বরটা খুব বেশীই হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রী জাতির কি কৌতূহল। এত জ্বরেও সে কি আনিয়াছি তাহা দেখিবার জন্য উঠিয়া বসিল !

আমি পকেট হইতে দুটি কুন্তলীনের শিশি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম, সুষমা তৎক্ষণাৎ শিশি দুটিকে টেবিলের নীচে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। ঝন্ ঝন্ করিয়া কাচগুলি শত খণ্ডে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, গৃহ সুগন্ধে পূর্ণ হইয়া গেল।

৪

বৌদিদিকে বলিলাম, "বৌদিদি, বৌকে বাপের বাড়ী

পাঠিয়ে দাও। এখন আমার পরীক্ষার সময়, পরীক্ষাটা হইয়া গেলে আনিব।" বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, "বৌ কাছে থাকিলে পরীক্ষা দেওয়া যায় না, এ জ্ঞান তোমার কবে থেকে হ'ল? সুষমার সঙ্গে কাল বোধ করি ঝগড়া হয়েছে, না?"

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "ছি বৌদিদি, এ সব গম্ভীর বিষয় নিয়ে ঠাটা তামাসা করা ভাল নয়।"

বৌদিদি আর বিশেষ কিছু বলিলেন না, বোধ হয় সুষমার নিকট ব্যাপার জানিতে গেলেন। বৌদিদি সম্ভবতঃ দাদাকে একথা বলিয়া থাকিবেন, কারণ তাহাকে কিছু প্রসন্ন দেখিলাম। কিন্তু সুষমার বাপের বাড়ী যাইবার কথা শুনিয়া পিসীমার অশ্রুবর্ষণ আরম্ভ হইল।

মন অত্যন্ত উদাসীন হইয়া উঠিল, বাজারে গিয়া এক খানি 'বেদান্তদর্শন' কিনিয়া আনিলাম।

সুষমার বাপের বাড়ী যাওয়াই স্থির হইল। আমি ঘরে বসিয়াছিলাম, বৌদিদি সুষমাকে সেখানে রাখিয়া গেলেন, দেখিলাম সুষমা কাঁদিতেছে।

সুষমাকে বলিলাম, "সুষমা, আমি যদি মরিয়া যাই, তুমি কি আমাকে মনে রাখিবে?" সুষমা কোন উত্তর দিল না, চোখের জলটা আরো বেশী বাড়িল দেখিলাম, কিন্তু আমার উপায় কি?

ভাবিলাম, সংসার মায়াময়, এ মায়ার বন্ধন হইতে যাহাতে শীঘ্র মুক্ত পাইতে পারি তাহাই করিতে হইবে।

সুষমা গিয়া বৌদিদিকে প্রণাম করিল, বৌদিদি তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। বৌদিদির চখেও জল পড়িতেছে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।

বারাণ্ডায় বসিয়া পিসীমা বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে-

ছিলেন, "পূজা সমুখে, এমন সময় কে কোথায় ঘরের বৌ পাঠায়? নরুর মা যদি বেঁচে থাক্‌তো, তা হলে কি এমন দিনে বৌ পাঠাতে দিত? আমি কে, যে আমার কথা ওরা শুন্‌বে?"

গাড়ী চলিয়া গেল, জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম। তারপর শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। তখনও ঘরখানি সুগন্ধে ভরপূর। সে কি কুন্তলীনের গন্ধ, না সুষমার অঙ্গসৌরভ, না তাহারই স্মৃতি, সৌরভের মত আমার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে? দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "মায়া! সমস্তই মায়া!" তাহার পর টেবিলের উপর হইতে 'বেদান্তদশন' খানি আনিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলাম।

৫

আমার ধর্ম্মভাব যে পূর্ব্ব হইতেই একটু প্রবল ছিল, দীর্ঘ কেশরাশিই তাহার প্রমাণ। কিছুদিন ভস্মাবৃত বহ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আমার ধর্ম্মবৃত্তি আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

বৌদিদিকে বলিলাম, "আমি আর মাছ খাইব না।" বৌদিদি বলিলেন, "পরীক্ষা পাস হইতে হইলে বুঝি মাছও ছাড়িতে হয়!"

আমাদের একটি প্রকাণ্ড ছাত্রসমাজ ছিল, সভ্যসংখ্যা ১৭ জন। সভার সভাপতি আমি স্বয়ং। সভায় প্রস্তাব করিলাম, "প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা অপেক্ষা, সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া হিমাচলে গিয়া ভগবানের ধ্যান করা অনেক ভাল। কেন না, পরীক্ষা দিয়া অসার উপাধিলাভে বাহিরের প্রতিষ্ঠা মাত্র; তদপেক্ষা, যাহা এক মাত্র সার সেই ভগবানের চরণলাভের উপায় চিন্তা করাই সর্ব্বাগ্রে উচিত।"

আমার এই সাধু প্রস্তাবে ১৪টি সভ্য সম্মতি প্রকাশ করিলেন, আর তিন জন যদিও এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন না কিন্তু এ সমস্ত কথা গোপন রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

জল খাবারের পয়সা জমাইয়া ক্রমশঃ ১৪ খানি কম্বল সংগ্রহ করা হইল, এবং ১৪টি ত্রিশূলের জন্য কামার-বাড়ী বায়না দেওয়া হইল। চুল ছাঁটা বন্ধ করিলাম, কাযেই চুল ক্রমেই লম্বা হইতে লাগিল। এইরূপ সন্ন্যাসের পূর্ব্বসূচনা আরম্ভ হইল।

ইতিমধ্যে পাঠ্য পুস্তকগুলিকে ডেস্কের মধ্যে বিশ্রাম করিতে দিয়া 'বেদান্তদর্শন' ও 'গীতা' পাঠে মনোনিবেশ করিলাম।

আমাদের সন্ন্যাস সভাটি ধীরে ধীরে উন্নতিলাভ করিতে লাগিল। ত্রিশূল প্রস্তুত হইয়া আসিল, গৈরিক বস্ত্রও সংগৃহীত হইল। চৌদ্দখানি ত্রিশূল যখন সূর্য্য কিরণে ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল, আমাদের উৎসাহও সেই সঙ্গে ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! ব্রহ্ম-অন্বেষণে গমনের জন্য মন ততই উতলা হইয়া উঠিল। কোন ক্রমে এখন এই পথটা অতিক্রম করিয়া হিমালয়ে গিয়া ধ্যান আরম্ভ করিলেই হয়। অবশেষে একদিন রাত্রে গৃহত্যাগ করিলাম। যাইবার পূর্ব্বে ডেস্কের উপর একখানি কাগজ রাখিয়াছিলাম, তাহাতে লেখা ছিল,—

"কোথায় সে জন, জানে কোন জন,
যে জন সৃজন লয় করে'—
তাঁহারই উদ্দেশে চলিলাম।"

যখন আমরা চৌদ্দজন তরুণ সন্ন্যাসী নিশীথের অন্ধকারে জঙ্গলের পথ ধরিলাম, সে সময়টার কথা একবার ভাবিয়া

দেখ। সেই নীরব রাত্রি, সেই নীরব পৃথিবী, সেই নীরব আকাশে নক্ষত্রেরা নীরবে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, সমস্তই আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। মনে হইতেছিল যেন দেবতারা তারার আলোকে আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছেন। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে গিয়া কেবলই পথ হারাইতে লাগিল। ধরা পড়িবার ভয়ে সোজা পথ ছাড়িয়া জঙ্গলের পথ ধরিয়াছিলাম. ইচ্ছা ছিল জঙ্গলপথে চলিয়া ক্রমশঃ নেপালের দিকে অগ্রসর হইব। কিন্তু জঙ্গলে বাঘ ভাল্লুকের ভয় ও অনাহারে মৃত্যুর ভয় আসিয়া আমাদের চিত্তকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ধর্ম্মপথের বিঘ্ন অনেক, তাহা না হইলে যে গৃহ-কারাগার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত অসীম জঙ্গলে ঘুরিতেছি, ব্রহ্মচিন্তার পরিবর্ত্তে সেই গৃহ-কারাকূপের চিন্তা সর্ব্বদাই মনে উদয় হয় কেন? বুঝিলাম, মায়ার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড় সহজ নহে। আবার কয়েক দিন বন ভ্রমণের পর পায়ে এত ব্যথা হইল যে বৃক্ষতলে পড়িয়া থাকা ভিন্ন অন্য উপায় রহিল না। অগত্যা তখন ষ্টীমারপথে চলাই উচিত মনে হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় টিকিট ক্রয় করিবার জন্য কম্বল কয়খানি বিক্রয় করিতে হইল!

ষ্টীমারে আসিয়াও বিপদ অল্প নহে। যাত্রীগণ হাঁ করিয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। বোধ হয় তাহারা আমাদের সেই ভস্মাবৃত তেজঃপুঞ্জ কলেবরে কোন অসাধারণ দীপ্তি দেখিতে পাইয়াছিল, নহিলে অমন করিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া থাকিবে কেন? দুই একটা সাহেব যেন আমাদের দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিতে লাগিল; আমার আশঙ্কা হইল হয় ত তাহারা আমাদের রাজনৈতিক সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিতেছে। এই জন্য আমাদের পলায়ন

সম্বন্ধে খবরের কাগজে কোন বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে কি না দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও খবরের কাগজ পড়িবার সাহস হইল না।

রাজঘাটে ষ্টীমার থামিল। দেখিলাম, জন কতক লোক ষ্টীমারে উঠিলেন, সারেংএর সঙ্গে তাঁহাদের কি কথা হইল। আমি রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, সারেং হাত বাড়াইয়া আমার দিকে দেখাইয়া দিল! লোক-গুলি উপরে উঠিয়া আসিলেন।

আমাদের কাছে আসিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের নাম বলিতে বোধ হয় কোন আপত্তি নাই ?"

আমি উত্তর করিলাম, "সন্ন্যাসীর পরিচয়ে প্রয়োজন কি ?"

"সম্ভবতঃ আপনারা মুঙ্গের থেকে আস্‌ছেন।"

"হইলেও হইতে পা— ”

তখন তিনি আমার সম্মুখে একখানি কাগজ ধরিলেন,—সেটি দাদার টেলিগ্রাম!

৬

অবশেষে কিনা বিশ্বাসঘাতক উমেশ আমাদের ধরাইয়া দিল! হায়, কোথায় গেল এতদিনের সন্ন্যাসের সাধ? আবার কিনা সেই গৃহপিঞ্জরে আসিয়া প্রবেশ করিতে হইল! ধরণীকে মনে মনে বলিলাম, "তুমি দ্বিধা হও আমি তোমার ভিতর প্রবেশ করি, তাহা হইলে আর আমাকে দাদার নিকট মুখ দেখাইতে হইবে না।" কিন্তু পৃথিবী আমার সে মিনতি শুনিলেন না; কলেরার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু সে-ও আমার প্রতি নির্দ্দয় হইল; বিষ ও ছুরির কোন সুবিধাও করিতে পারিলাম না; অগত্যা সুস্থ শরীরে আবার সেই চিরপরিচিত বাড়ীর

দুয়ারে গাড়ী হইতে নামিলাম। পিসীমা "ওরে বাপ নরুরে! এমন করে কি প্রাণবধ করে যেতে হয় রে!" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

দাদা একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "এখন একটু কান্নাকাটি থামাও। খেয়ে দেয়ে হতভাগাটা আগে ঠাণ্ডা হোক, তারপর যত পার কেঁদো।"

যাহা হউক, অনেক দিনের পর বৌদিদির হাতের রান্না খাইয়া শরীর স্নিগ্ধ হইল।

আহারান্তে বৌদিদি বলিলেন, "ঠাকুরপো, 'সে জনের' কোন সন্ধান পেলে কি?"

"যাও যাও বৌদি! তোমরা সে সব কথা কি জান্‌বে?"

"তা জানি আর নাই জানি, কিন্তু চেহারাখানি তো বেশ সন্ন্যাসীর মতই করেছ দেখ্‌ছি! পা দুখানিরই বা বাহার বেরিয়েছে কি!"

বৌদিদির এই কথা শুনিয়া মনে করুণরসের আবির্ভাব হইল; সকরুণভাবে পথের দুর্দ্দশা-কাহিনী বৌদিদির নিকট বর্ণনা করিলাম।

* * * *

পর বৎসর পরীক্ষায় আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম। যে দিন ফল বাহির হয় তাহার পরদিন দুই শিশি কুন্তলীন ও এক শিশি দেলখোস কিনিয়া আনিলাম। সুষমার হাতে দিয়া বলিলাম, "সুষমা এবারও কি ভাঙ্গিয়া ফেলিবে?" সুষমা কুন্তলীনের শিশি দুটির গায়ে "ঋণ শোধ" ও দেলখোসের শিশিটির উপরে "সুদ শোধ" লিখিয়া দিল, এবং শিশি কয়টী টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিল।

ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখি হাস্যমুখী বৌদিদি আমার সম্মুখে!

বৌদিদি বলিলেন, "ঠাকুরপো! সন্ন্যাসী হয়ে তো 'সে জনের' কোন সন্ধান পেলে না, এখন ঘরে বসে বোধ করি কিছু সন্ধান পেয়েছ।"

পিসীমা সে দিন অনেক ব্রাহ্মণ খাওয়াইলেন ও হরিরলুট দিলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা সুখের বিষয় এই যে, দাদা সে দিন আদর করিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দাসী
কলিকাতা।

নবম বৎসরের প্রথম পুরস্কার।

শাস্তি।

(১)

রায়গঞ্জের উমাচরণ বসু যখন ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে পত্নীর সহিত মিলিত হইলেন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনোদচন্দ্র বিবাহিত; সবে মাত্র সে এফ, এ, পাশ করিয়াছে! কনিষ্ঠ প্রমোদচন্দ্র পিতার মৃত্যুতে ও বিধবা পিসীমার আদরে ঘুড়ি লাটাই লইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিল, এবং তাহার শৈশবের অমূল্য সময়টুকু রায়গঞ্জের জমিদার বাবুদের এণ্ট্রান্স স্কুলে অতিবাহিত না হইয়া রামধন মুদি ও মদন কলুর দোকান ঘরেই কাটিতে লাগিল। বিনোদচন্দ্র কৃষ্ণনগরে শ্বশুরের বাসায় থাকিয়া বি, এ, পড়িত, এবং মহার্ঘা অবসরটুকু বৃথা নষ্ট না করিয়া জরির ফিতা, পশম, "কুন্তলীন, "দেলখোস" প্রভৃতি উপহার দ্বারা আপনার বালিকা পত্নীর হৃদয়রাজ্য অধিকার করিবার মহৎ সংকল্পে অহরহ ব্যস্ত থাকিত।

অবশেষে ওকালতি পরীক্ষায় পাশ হইয়া বিনোদচন্দ্র ওকালতি করিবার জন্য রায়গঞ্জের জেলাকোর্টে সামলা মস্তকে বহির্গত হইল; আর চতুর্থ শ্রেণীতেই মা সরস্বতীর কাছে বিদায় লইয়া প্রমোদচন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে ঘরে বসিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্নপরিপাক কার্য্যে মনঃসংযোগ করিল। বিনোদচন্দ্রের পত্নী শ্রীমতী মোহিনীসুন্দরী প্রথম হইতেই

এই অকর্ম্মণ্য দেবরটিকে তেমন স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারিত না! পিসীমার ভয়ে সে কখনও আপনার হৃদয়ের অপ্রীতি ব্যক্ত করিতে না পারিলেও, প্রমোদচন্দ্র বুঝিয়াছিল যে, তাহার চাল চলন কথাবর্ত্তা প্রভৃতি সমস্তই বধূঠাকুরাণীর নিকট নিতান্ত অশোভন দেখাইতেছে; এ জন্য আন্তরিক দুঃখিত হইয়া সে বেচারা রামধনের দোকানে গান গাহিয়া ও তবলা বাজাইয়া দিবসের অধিকাংশ সময়ই অবাধে ক্ষেপণ করিতে লাগিল! তার পর পিসীমার অশ্রু, অনুরোধ ও আবেদন প্রভৃতির মধ্যে পড়িয়া, শঙ্খরোলে সমগ্র পল্লী সচকিত করিয়া প্রমোদচন্দ্র একদিন নববধূ গৃহে আনিল।

বধূটির নাম লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর রূপে এমন স্নিগ্ধ লাবণ্য বিকশিত হইতেছিল যে, তাহা দেখিয়া পল্লীবাসিনীগণ সকলেই প্রশংসা করিল! চক্ষু দু'টিতে এমন কমনীয় করুণভাব ও সমগ্র দেহশ্রীর মধ্যে এমন সলজ্জ সঙ্কোচ বর্ত্তমান ছিল যে, মেয়েটিকে ভাল না বাসিয়া থাকা যায় না! স্বর্গগত ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার উদ্দেশ্যে দুই বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিয়া পিসীমা সাদরে নববধূকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। বিনোদচন্দ্র আসিয়া বধূর মস্তকে হস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কেবল বধূর রূপের প্রশংসায় মোহিনীর হৃদয়ে হিংসার বহ্নি প্রধূমিত হইতে লাগিল।

(২)

তাহার পর আরও পাঁচ ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এ কয় বৎসরে বিনোদচন্দ্রের সংসারে কতকগুলি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; পিসীমার মৃত্যু হইয়াছে, এবং তাহার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

পিসীমার মৃত্যুর পর মোহিনীর হৃদয়সঞ্চিত বহ্নি

কণাটুকু দীপ্যমান হইয়া শত সহস্র ছিদ্রপথ দিয়া আপনাকে বিকীর্ণ করিতে উদ্যত হইল!

রাত্রে শয্যায় পড়িয়া লক্ষ্মী যখন নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিত, তখন প্রমোদ আসিয়া সাদরে তাহার অধরে চুম্বন করিয়া অশ্রু মুছাইয়া কহিত, "গুরুজনের কথায় দোষ ধর্‌তে নাই। ছিঃ লক্ষ্মী, কেঁদনা! সব সহ্য করে থাকো।" এই আদরে লক্ষ্মীর হৃদয়ের সমস্ত বন্ধন যেন শিথিল হইয়া যাইত, এবং সে স্বামীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া অশ্রু প্রবাহ মুক্ত করিয়া দিত। প্রমোদ কহিত, "আমার সঙ্গে বিয়ে না হ'য়ে আর কার সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে হত, লক্ষ্মী, তা হ'লে তুমি কত সুখী হ'তে!" এই কথায় লক্ষ্মী স্বামীর বক্ষ হইতে মস্তক তুলিয়া সবেগে বলিয়া উঠিত, "যাও, তোমার ও কথা ভারি অন্যায়"—লজ্জায় হঠাৎ লক্ষ্মীর মুখ অবনত হইত, সে আর কিছু বলিতে পারিত না!

একদিন মোহিনীর চট্ করিয়া মনে পড়িল যে তাহার নির্ব্বোধ স্বামীটির প্রতি চতুর দেবর বড়ই অবিচার করিতেছে! একজন ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে, আর একজন নিশ্চিন্ত মনে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিবে, ইহা ভাবিয়া তাহার নিরপেক্ষ দয়ার্দ্র নারী-হৃদয় বড় ব্যথিত হইয়া উঠিল। সেদিন দেবর যখন ভোজন-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন তখন মোহিনী নিকটে বসিয়া কহিল, "ঠাকুরপো, একটা কথা আছে!" "কি কথা বৌদি'!" "এই গিয়ে তোমার দাদা তোমাকে চাকরীর চেষ্টা দেখ্‌তে বল্‌ছিলেন।" মৃদু হাসিয়া প্রমোদ কহিল, "এতদিন পরে চাকরীর চেষ্টা যে!" মুখটা একটু ঘুরাইয়া মোহিনী কহিল, "কি জানি ভাই, তবে উনি বল্‌ছিলেন যে, 'আমি একা কাঁহাতক পেরে উঠি? একা কতই বা উপার্জ্জন

করবো'? প্রমোদ কহিল "ছেলে বেলা থেকে আমার চরিত্রটা এমন করে গ'ড়ে তোলা হয়েছে যে, সুস্থির হ'য়ে কোন কাযে লেগে যাব, এমন ত মনে হয় না! চাকরী আমাকে কে দেবে বলত বৌদি'?" মোহিনী নেত্রযুগল বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "তা আমি মেয়ে মানুষ সে কথা কি জানি বল?—তবে উনি বল্‌ছিলেন কি না যে, 'হাত পা আছে ত! আপদে বিপদে স্ত্রী পুত্রের জন্যে আমাকে ত একটা সংস্থান করতেও হবে,!" প্রমোদ গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "তা হলে দাদা কি আমাদের ত্যাগ করবেন নাকি?" —মোহিনী কোন কথা বলিল না।

আহারের পর জলের গ্লাস মুখ হইতে নামাইয়া প্রমোদ কহিল, "দাদা যদি এমন কথা বলে থাকেন, আজ থেকে চাকরীর চেষ্টায় থাকবো।"—অভিমানে প্রমোদচন্দ্রের স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

এ দিকে মোহিনীসুন্দরী নির্ব্বোধ স্বামীর বুদ্ধি মার্জ্জিত করিতে একটুও নিশ্চেষ্ট ছিল না। কৃষক যেমন কঠিন মৃত্তিকাকে অবিরত বারিবর্ষণ দ্বারা উর্ব্বর ও বীজ বপনের যোগ্য করিয়া তোলে, এই বুদ্ধিমতী রমণীটিও তেমনই তাহার স্বামীর হৃদয়-ক্ষেত্রটিকে কখন অশ্রু-বর্ষণে কখন উপদেশধারা সেচনে ক্রমশঃ উর্ব্বর করিয়া তুলিতে লাগিল। রাত্রে মোহিনী স্বামীকে কহিল, "ঠাকুরপো বল্‌ছিল চাকরী করবে!"

বিনোদচন্দ্র তখন মনোযোগ সহকারে একটা আপীলের 'খসড়া' দেখিতেছিল; তাহার উপর হইতে চক্ষু না তুলিয়াই কহিল, "বটে, চাকরী দিচ্ছে কে?

মোহিনী ধীরে ধীরে কহিল, "কলকেতায় কে ওর বন্ধু আছে, সেই নাকি করে দেবে।"

বিনোদচন্দ্র কাগজ দেখিতে দেখিতে কহিল, "হুঁ, পাগল আর কি! চাকরী ত আর গাছের ফল নয় যে পেড়ে দেবে! কি লেখা পড়া জানে যে চাকরী করবে?"

ছোট একটু ভ্রুকুটি করিয়া মোহিনী কহিল, "ঐ তোমার এক কথা বাবু! ও ত আর বলছে না যে জজ হব! যেমন বিদ্যে তেমনই চাকরী করবে বলছে!"

বিনোদচন্দ্র কহিল, "কেন এত কি অভাব হয়ে উঠ্‌ল যে, চাকরীর জন্যে মাথা ব্যথা ধরেছে।"

পানের ডিবেটা বিনোদচন্দ্রের সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিয়া মোহিনী কহিল, "কেন প্রায়ই ত বলে, 'পরের ভাত খেয়ে আর থাকতে পারি না! নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াবো, কারুর কাছে কোনও জবাবদিহি থাকবে না'।"

বিনোদচন্দ্র আপীলের কাগজ খানা রাখিয়া দিল, কোন কথা বলিল না।

মোহিনী কহিল, "ও ছোট বৌকে বাঘের মত ভয় করে! ছোট বৌ কি কম শোনায়? ছোট বৌ কত বল্‌ছিল, 'পুরুষ মানুষ হায় পরের ভাত খেতে লজ্জা করে না? যার খেটে খাবার সাধ্যি নেই তার আবার বিয়ে করা কেন?'—তা আমি বল্লুম, 'বড় ভাইয়ের খাবে, বড় ভাই কি পর হ'ল।' শুনে আমাকে এমন মুখ ঝাপটা দিয়ে উঠ্‌ল!"

বিনোদ—"প্রমোদ কি বললে?"

মোহিনী—"ঠাকুরপো বল্‌লে, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ', সবাইকে জানি! চাকরী একটা জোটাতে পারলে কি আর এখানে পড়ে থাকি'?"

"বটে!" বলিয়া বিনোদ খুব গম্ভীর হইয়া রহিল।

(৩)

অনেক সময়েই দেখা যায় মানুষ যখন কোনও অশুভ সঙ্কল্পে আপনার সমস্ত শক্তি পরিচালিত করে, তখন বিধাতা-পুরুষ অলক্ষ্যে থাকিয়া এমন একটি নিগূঢ় জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেন যে, এক দিন তাহা বজ্রের ন্যায় পাপীর হৃদয়ে আঘাত করিয়া তাহার সমস্ত সঙ্কল্প বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে! যখন মোহিনী এই ভ্রাতৃত্ববন্ধন ছেদন ও গৃহবিচ্ছেদ কার্য্যে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে তাহার শিশুপুত্র নলিন তাহার সুকোমল হৃদয়ের সব টুকু ভালবাসা দিয়া কাকাবাবু ও কাকিমাকে নিবিড় বন্ধনে বেষ্টন করিয়াছিল। তাহার প্রতি কাকাবাবুর ও কাকিমার স্নেহেরও সীমা ছিল না। কাকাবাবু যেখানে যাইবে নলিনকে সঙ্গে লইতেই হইবে, নচেৎ সে কাঁদিয়া কাটিয়া হুলস্থূল বাধাইয়া দিবে।

এইরূপে ছোট বড় প্রত্যেক বিষয়ে নলিন কাকা বাবুর নিত্য সহচর হইয়া উঠিল। পুত্রের এই বিসদৃশ ব্যবহারে মোহিনী বিরক্ত হইত, মধ্যে মধ্যে তাহাকে তিরস্কারও করিত; কিন্তু পুত্রের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিত না।

সেদিন নলিন কাকাবাবুর সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিল। যখন ফিরিয়া আসিল তখন বেলা দশটা বাজিয়াছে। বিনোদও সেদিন একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যে বাহিরে গিয়াছিল। নলিকে লইয়া প্রমোদ ফিরিয়া আসিলে মোহিনী বাতাসের সহিত কলহ আরম্ভ করিল, "ছেলেটাকে আর বাঁচ্‌তে দেবে না দেখ্‌ছি! এত বেলা অবধি ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হ'ল! ওটা ত মরেও না, দু চক্ষুর বিষ হয়ে আছে! কেন রে বাবু, তোর বিষয়ের বখরা নিতে যাচ্ছে না কি?

আর ছেলেটাও তেমনই হয়েছে! 'কাকাবাবু' বল্‌তে অজ্ঞান. কাকাবাবু ছাতা দিয়ে মাথা রাখবেন!" ইত্যাদি;- লক্ষ্মী প্রমোদকে কহিল, "শুনছ?" "কি?" "দিদি কি বলছে!" ঈষৎ হসিয়া প্রমোদ কহিল, "তোমার দিদির মাথা গরম হয়েছে, 'কুন্তলীন' ভিন্ন দেখচি এমন গরম মাথা ঠাণ্ডা হবে না।"

সন্ধ্যার পর বিনোদ বাটী ফিরিল। সেদিন কোর্টে একটা মোকদ্দমায় হারিয়া সে বিপক্ষ পক্ষের উকীল কর্ত্তৃক বড়ই লাঞ্ছিত হইয়াছিল, তাই মনটাও ভারী খারাপ ছিল। গৃহে ফিরিতেই মোহিনী প্রভাতের ক্ষুদ্র ঘটনাটি নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া স্বামীর কর্ণে উপহার প্রদান করিল। সয়তান ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া সরলা ইভকে জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাওয়াইতে সমর্থ হইয়াছিল; এই মায়াবিনী মোহিনী যে প্রখর রূপের মোহে ও সুসম্বদ্ধ বচনবিন্যাসে বিনোদচন্দ্রের মত একটি পত্নীপরায়ণ যুবকের দুর্ব্বল চিত্ত বশীভূত করিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কি আছে?

মন্ত্রদীক্ষিত বিনোদ বাহিরে আসিয়া গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "প্রমোদ।"

"যাই দাদা!" বলিয়া প্রমোদ বাহিরে আসিল।

বিনোদ কহিল, "তুমি চাকরীর চেষ্টা দেখ্‌বে বলছিলে, তাই দেখ; এ বাড়ীতে সকলের অসুবিধা হচ্চে, অন্যত্র থাকলে ভাল হয়; দিবারাত্রি 'খিটিমিটি' আর আমার সহ্য হয় না!"

অবনত মস্তকে প্রমোদ কহিল, "বল, কোথায় যাব।"

বিনোদ এক নিশ্বাসে কহিল, "এ বাড়ীর অংশ যা পাবে তার ন্যায্য দাম দেব, তা ছাড়া আর কিছু টাকা দেব; চাকরীর চেষ্টা দেখ। অবশ্য বাড়ীর অংশ--"

বিনোদের কথায় বাধা দিয়া প্রমোদ কহিল, "কিছু দরকার নেই দাদা! সে সব নলিকে আমি দিয়ে গেলুম।"

বিনোদ কহিল, "না, না, তুমি খাবে কি করে?"

প্রমোদ কহিল, "সে সব কিছু ভেবো না দাদা! আমি সব ঠিক করে নেব।"

"মনে করো'না প্রমোদ, আমি তোমাকে ফাঁকি দেব!"

—"এমন কথা কোন দিন আমার মনে হয়নি দাদা! আমাদের জন্য তুমি অনেক কষ্ট করেছ, তোমার ঋণ কখনও শোধ দিতে পারবো না। আমার সহস্র দোষ আছে, ছোট ভাই ব'লে মাপ করো।"

* * * * *

নানাবিধ উপকার সহায়তা প্রভৃতি দ্বারা প্রমোদ সমগ্র পল্লীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল; তাহার আবার আশ্রয়ের অভাব কি? সেই রাত্রেই উত্তম মণ্ডলের খাপরার ঘর ঠিক করিয়া আসিয়া দাদাকে প্রণাম করিতে গেল; কহিল, "দাদা আশীর্ব্বাদ কর, যেন কখনও মনুষ্যত্ব না হারাই!" বিনোদ চুপ করিয়া রহিল। অনুতাপে যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল; কতবার সে ভাবিল, "প্রমোদের দুই হাত ধরিয়া ফিরাই, বলি অভিমান ক'রে যাচ্ছিস ভাই?"—কিন্তু ধিক লজ্জা! মোহিনীকে প্রণাম করিয়া প্রমোদ কহিল, "বৌদি', তুমি গুরুজন হচ্ছ, বড় হচ্ছ, রাগ রেখোনা, আমাদের মাপ করো।" লক্ষ্মী কহিল, "নলিকে একটি বার দেখ্‌তে দেবে দিদি? "না ভাই, সে এখন ঘুমুচ্ছে, তা'কে আর জাগিয়ো না।" "সে ঘুমুচ্ছে, তবে থাক্ দিদি!—এইখান থেকেই তাকে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি, সে যেন চিরজীবি হ'য়ে থাকে!"

প্রমোদ ও লক্ষ্মী সরিয়া আসিলে মোহিনী কহিল,

"একবারে ডাইনের মায়ায় ছেলেটাকে ঘিরে রেখেছে গা! এবার ছেলেটা বাচবে বলে ভরসা হচ্ছে!" কথাগুলা প্রমোদের কর্ণে প্রবেশ করিল! সে শিহরিয়া উঠিল, মনে মনে কহিল, "হে ভগবান, এ সমস্ত অকল্যাণ হ'তে নলিনকে রক্ষা করো! কোন অমঙ্গল যেন তাকে না স্পর্শ করে!" পরে লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া সেই গভীর নিস্তব্ধ নিশীথে প্রমোদ তাহার অশেষ সুখ দুঃখের স্মৃতি-মণ্ডিত আজন্মের গৃহ ত্যাগ করিল। দারুণ বেদনায় তাহার অস্থিপঞ্জর শতধা চূর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

৪

পরদিন প্রভাতে নলি যখন তাহার কাকাবাবু ও কাকিমাকে কোথায়ও দেখিতে পাইল না, তখন সে 'কাকাবাবু। 'কাকাবাবু'। বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। মাতা আসিয়া পুত্রকে প্রহার করিয়া কহিল, "কাকাবাবুর উপর যে ভারী টান দেখছি।"---বিনোদ কহিল, "কেন ছেলেটাকে মারছ?" পিতাকে দেখিয়া নলি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "কাকাবাবুল কাতে দাব বাবা।"

সেদিন নলি তাহার কাকাবাবু ও কাকিমাকে অনেক বার খুঁজিল, পরে তাহাদের অভাব তাহার অসহ্য বোধ হইল! মনের কষ্ট ও দুর্ভাবনায় একদিন অপরাহ্নে নলির জ্বর আসিল, পরে সেই জ্বর প্রবল বিকারে পরিণত হইল। বিকারের ঘোরে শিশু বার বার তাহার কাকাবাবুকে ডাকিতে লাগিল। মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য বিনোদ অপরাধী; প্রমোদকে ডাকিতে তাহার সাহস হইল না। অবশেষে একদিন সন্ধ্যা বেলা রোগতপ্ত শিশু তাহার মানব জীবনের সমস্ত অভিনয় অসমাপ্ত রাখিয়া, শুভ্র অকলঙ্ক হৃদয় লইয়া ভগবানের চরণপ্রান্তে শান্তিলাভ করিল। *

যেদিন নলি ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল, তাহার পরদিন প্রভাতে প্রমোদ নিতান্ত অপরাধীটির ন্যায় বিনোদ-চন্দ্রের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল! শিশুর পীড়ার সংবাদ কেহই তাহাকে জানায় নাই; সে এ দুর্ঘটনার বিষয় কিছু জানিত না। অনেক দিন নলির সংবাদ না পাইয়া তাহার ব্যাকুল চিত্ত অতিশয় অশান্ত হইয়া উঠিতেছিল; তাই প্রমোদ আজ কম্পিত-হৃদয়ে নিতান্ত অপরাধীর ন্যায়, যে গৃহ হইতে সে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারই দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। সমস্ত সঙ্কোচ দূরে ঠেলিয়া ধীরস্বরে বাহির হইতে ডাকিল, "নলি!"—কোন উত্তর নাই! একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। দ্বারের নিকট আর একটু অগ্রসর হইয়া প্রমোদ কম্পিতকণ্ঠে আবার ডাকিল, "নলি!"—এবারও কোন উত্তর নাই!—'তবে কি নলির অসুখ করিয়াছে?—হে ভগবান, তাহাকে সুস্থ করিয়া দাও।' প্রমোদ আর একটু অগ্রসর হইয়া অনুচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "দাদা!" তবুও কেহ উত্তর দিল না! অবশেষে সাহসে ভর করিয়া প্রমোদ বাটির মধ্যে প্রবেশ করিল। ধীরে ধীরে ডাকিল, "বৌদি!"—সহসা পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে কাহার রোদনধ্বনি শ্রুত হইল! আশঙ্কায় ভাবনায় অস্থির হইয়া প্রমোদ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল! মোহিনী বসিয়াছিল প্রমোদকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। কহিল, "ঠাকুরপো, এসেছ,—এস ভাই বস!" প্রমোদের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল; তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; সে কিছু বুঝিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "নলিকে একবার শুধু দেখতে এসেছি!" মোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "তোমার নলিকে তুমি ফিরিয়ে আন ঠাকুরপো! ফিরিয়ে আন"—

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রমোদ কহিল, "কোথায় গেছে নলি?"

সে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে গো। তাকে তুমি ফিরিয়ে আন। ঠাকুরপো ফিরিয়ে আন। আমার পাপের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে গো ”

“এঁ্যা! সে কি কথা!” প্রমোদ স্তম্ভিতভাবে বসিয়া পড়িল। মোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, “আহা, শেষ পর্য্যন্ত সে তোমাকে দেখতে চেয়েছিল, তবু আমি হতভাগী তোমাকে ডাকি নি।”

“উঃ!” বলিয়া প্রমোদ চোখের জল মুছিল। এমন সময়ে আর্দ্র কণ্ঠে বিনোদ ডাকিল “প্রমোদ!”—“দাদা!” বলিয়া প্রমোদ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। জড়িত কণ্ঠে বিনোদ কহিল, “প্রমোদ, বাড়ী এস ভাই। আমি দাদা হচ্ছি, আমার কোন অপরাধ মনে রেখো না। ছোট বৌমাকে নিয়ে এখনই বাড়ী এস।” প্রমোদ কিছু বলিল না—তাহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, নলি এ জগতে নাই!—সে কি কথা? বিনোদ কহিল, “আমার মতিভ্রম হয়েছিল, সে সব কথা মনে রেখো না ভাই। ছোট বৌমাকে নিয়ে এসগে।” বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া বাষ্পজড়িত কণ্ঠে প্রমোদ কহিল, “দাদা!”—“ভাই!” বলিয়া বিনোদ প্রমোদকে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল। কেহই অবিরল অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। উভয়েরই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মোহিনী চোখের জল মুছিতে মুছিতে কহিল, “আমার মত পাপী নেই গো! এ সব আমারই পাপের শাস্তি। নলি আমাকে খুব শাস্তি দিয়ে গেছে। ঠাকুরপো আমাকে মাপ কর ভাই। যাও, ছোট বৌকে এখনই নিয়ে এস, আমি আর এ শূন্য পুরীতে থাকতে পারচিনে।”

অসহ্য শোকের মধ্য হইতে আজ এই যে অপূর্ব্ব শান্তি সঙ্গীত উত্থিত হইতেছিল, তাহা বিধাতার আশীর্ব্বাদের ন্যায়ই পবিত্র ও নির্ম্মল! আজিকার এই অশ্রুধারার বহু-দিনের সঞ্চিত হিংসাবহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কিন্তু হায়, যে ক্ষুদ্র শিশু তাহার সুকোমল নির্ম্মল প্রাণপুষ্পটি মৃত্যুর অনলে আহুতি দিয়া এই বিচ্ছেদাহত সংসারটিতে পুনর্ম্মিলনের নিবিড়তা দান করিয়াছে,—সে এখন কোথায়?

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এ,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

দশম বৎসরের প্রথম পুরস্কার।

অসংযত।

১

শশিভূষণ যখন তৃতীয়বাব পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতেছিল, তখন কোন কারণে সে মাষ্টাব মহাশয় কর্ত্তৃক অত্যন্ত প্রহৃত হয়। সে দিন বাড়ী যাইয়া তাহার জ্বর আসে।

শশিভূষণের ঠাকুরমা, মাষ্টাব মহাশয়ের উদ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের আহার্য্যের সুব্যবস্থা করিয়া বলিলেন, "দরকাব নেই বাপু তোর ইস্কুল গিয়ে, বেচে থাক তোব দাদারা, তোর ভাবনা কি?" শশিভূষণের বড় দুই দাদা,—একজন স্থানীয় জমীদাবের ম্যানেজার, আর একজন উকিল,—সে কথা শুনিলেন; কিন্তু কিছু বলিলেন না। বোধ হয় তাঁহারা শশীর মত বুদ্ধিমান বালকের জন্য অর্থ ব্যয়টাকে নিতান্তই নিরর্থক ভাবিতেন, না হয়, পিতৃমাতৃহীন শশীর ভার ঠাকুরমার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন,—এবং তাঁহার উপর কথা কহা অনধিকার চর্চ্চা ভাবিতেন।

জ্বর সারিতে শশিভূষণের বিলম্ব হইল না—বিশেষ যখন ইস্কুল না যাওয়া রূপ এতবড় একটা প্রীতিপ্রদ ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে বর্ত্তমান! এরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া সে নিজেকে অত্যন্ত সুখী বোধ করিল; এবং সহসা

তাহার এই সৌভাগ্যোদয়ে নাকি তাহার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত বিচ্ছেদের উপক্রম হইয়াছিল।

শশিভূষণের প্রকৃতিটা অদ্ভুত রকমের ছিল। ক্লাসে যখন মাষ্টার মহাশয় অঙ্ক বুঝাইতে গলদঘর্ম্ম হইতেন, তখন সে অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে তাহাদের ইস্কুলঘরের সম্মুখস্থ বাঁশ বনের প্রত্যেক পাতার কম্পনটি পর্য্যন্ত দেখিতে ব্যস্ত। সে অত্যন্ত নিরীহ ছিল, এমন কি মাষ্টার মহাশয়ের কঠিনতম শাস্তি পর্য্যন্ত নির্ব্বাক ভাবে সহ্য করিত; কিন্তু যে দিন ঘন-ঘোর মেঘ তাহাদের ইস্কুলঘরের ছাদ হইতে বাঁশ বনের মাথা এবং নদীর কুল পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিত, সে দিন মাষ্টার মহাশয়ের অত্যন্ত খরতর দৃষ্টি লঙ্ঘন করিয়াও সে ভাঙ্গন-ধরা নদীর কূলে, বটগাছের তলায় চুপ্‌চাপ্ করিয়া গিয়া বসিত! সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ধীরে ধীরে নামিয়া আসিত, তখন সে মুগ্ধ হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত! শশীর দাদার বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেন, ছোঁড়াটা বড় Sentimental হবে, কেহ বা বলিতেন, পাগল হওয়া ছাড়া তার অন্য কিছু হওয়ার লক্ষণ দেখা যায় না।

ইস্কুল ত্যাগ করিয়া ক্ষুধিতের মত সে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। সেই পুরাতন বাঁশ বন, আমবাগান, বটগাছ, আঁকা বাঁকা নদী, কিন্তু তাহাদেরই উপর কি অপূর্ব্ব নেশা! তাহাদেরই ভিতর সে সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং যখন শ্রান্তি বোধ করিত তখন নদীর কূলে গিয়া বসিত। সেখানে দেখিত বড় বড় নৌকা ভাসিয়া আসিতেছে—তাহাদের মাঝিরা তালে তালে দাঁড় ফেলিতেছে, আর সেই শব্দে সুর মিলাইয়া কাঁপাগলায় আপনাদের সুখ দুঃখের গান গাহিতেছে।

এমনি করিয়া সে জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান দিন কয়টা নদীর কূলে, ও গাছের তলায় কাটাইয়া দিল। ঠাকুরমার যে অঞ্চল তাহাকে পৃথিবীর ঝঞ্ঝাবাত হইতে রক্ষা করিতেছিল, বেচারা জানিত না, যে দিন তাহা অপসারিত হইয়া যাইবে, সে দিন তাহার আশ্রয়হীন মস্তককে বজ্রপাত হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

কিন্তু এখানেও যদি শেষ হইত, তাহা হইলে না হয় সে এক রকম করিয়া তাহার জীবনটাকে কাটাইয়া দিতে পারিত. কিন্তু তাহাও হইল না। মৃত্যুর তিন মাস পূর্ব্বে ঠাকুরমা ধুম ধাম করিয়া শশীর বিবাহ দিলেন। তাহার পর একদিন সন্ধ্যায় শশীকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

২

থিয়েটারে যেমন মুহূর্ত্তের মধ্যে অট্টালিকা, উপবন, অন্তর্হিত হইয়া তাহার স্থানে ভীষণ প্রান্তর আসিয়া উপস্থিত হয়, ঠাকুরমার মৃত্যুর পর সংসার তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য ত্যাগ করিয়া তেমনি শশীর সম্মুখে ভীষণ ভাবে দেখা দিল। আজ প্রথম শশী নিজেকে ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পাইল। এই দীর্ঘ সংসারযাত্রার জন্য সে কি পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছে? হায়, সে তাহার জীবনযাত্রার জন্য অত্যাবশ্যকীয় যাহা, তাহাও জুটাইতে পারে নাই।

তাহার উপর তাহার দাদাদের উদাসীন ভাব তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। উহা যেন তাহার অযোগ্যতাকে তাহার নিকট শতগুণে স্পষ্ট করিয়া তুলিল! তাহার মত অপদার্থ লোককে দু'মুঠা খাইতে দিয়াই কি তাঁহারা যথেষ্ট করেন নাই? সে তাহার উপর এমন কি সুকৃতি করিয়াছে যে, তাঁহাদের সহিত মিশিবার যোগ্য হইতে পারে?

শশী চাকুরীর জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল,—কে তাহাকে চাকুরী দিবে? চাকুরীর আশায় শ্বশুরকেও অনুরোধ করিল; তিনি কোন উত্তরই দিলেন না। অবশেষে সে বার টাকা বেতনে স্থানীয় জমিদারের গোমস্তা নিযুক্ত হইল।

পাখী যেমন কুলায়ের ভিতর থাকিয়া ঝঞ্ঝা হইতে আপনাকে রক্ষা করে, তেমনি শশী কাছারির সময় ভিন্ন সকল সময়ই আপনার ক্ষুদ্র গৃহে আপনাকে পৃথিবীর ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্য হইতে রক্ষা করিত!

৩

শশীর শ্বশুর শুনিলেন, জামাতার চাকুরী হইয়াছে; সুতরাং কন্যা সুভাকে জামাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

যে তাহার জীবনের চিরসঙ্গিনী—আজ সন্ধ্যার পর তাহার সহিত দেখা হইবে! শশীর জীবনেও যে আজ একটা নূতন দিন, তাহা সে অনুভব করিল।

একটি ছোট বেতের বাক্সে করিয়া এক শিশি কুন্তলীন, দেলখোস, এবং একখানা কবিতার বই লইয়া, শশী তাহার গৃহে প্রবেশ করিল। সুভার কাছে গিয়া বলিল,

'সুভা তোমার জন্যে এনেছি,'—বলিয়া এক এক করিয়া সুভার হাতে দিতে গেল।

পাথরে যেমন দাগ পড়ে না, তেমনি সুভার মুখ একটুও পরিবর্ত্তিত হইল না, পাশের টেবিল দেখাইয়া বলিল, 'রাখ'।

কলের পুতুলের মত শশী তাহার উপর জিনিস কয়টা রাখিয়া দিল।

তার পর সুভা কথা কহিল, 'ক টাকা মাইনে হ'ল'?

শশী একবার সুভার মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল 'বার'।

'ওমা ছি! বার টাকার মাইনের চাকরী ক'ত্তে লজ্জা

হ'ল না! মাসান্তে একটা লোকের কাপড় চোপড়েই ত' বার টাকা কুলোবে না।'

দম্পতীর এই প্রথম আলাপ! শশিভূষণ কাঠের পুতুলের মত চাহিয়া রহিল।

* * * *

প্রতি রাত্রে তাহাদের মধ্যে যে আলাপ হইত, তাহাতে কোন বৈচিত্র্য ছিল না। সুভা বসিয়া বসিয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত। তাহার জায়েদের অবস্থা কত ভাল, আর সে তাহাদের দাসীর মত হইবার যোগ্যও নহে! যাহার পত্নীকে স্বচ্ছন্দে রাখিবার ক্ষমতা নাই, সে বিবাহ করে কেন? বার টাকায় তাহার কি হইবে? সে তাহার পিতামাতার আদরের কন্যা, শশীর হাতে পড়িয়া তাহার কি দুর্দ্দশা—বলিয়া সুভা কাঁদিতে থাকিত, এবং শশিভূষণ মৃতের মত ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া নিজের বিছানায় পড়িয়া থাকিত।

সংসারে অবহেলা হইতে শশিভূষণ নিজের গৃহে নিজেকে রক্ষা করিত, কিন্তু সেখানেও অগ্নিস্পর্শ হইয়াছিল; সুতরাং সে বাহিরে বাঁচিবার উপায় খুঁজিতে বাহির হইল। খুঁজিয়া খুঁজিয়া সে যে উপায় আবিষ্কার করিল, তাহার কথা না লিখিলেই ভাল হইত।

শশীর এক বন্ধু এক গ্লাস মদ দিয়া কহিল 'খেয়ে দেখ ভাই, এতে কোন দুঃখ, কোন কষ্ট থাকবে না; সব জ্বালা যন্ত্রণা ভুলে যাবে।'

অমৃতের মত সাদরে গ্রহণ করিয়া শশী বলিল 'সত্যি বলছ?'

"হাঁ সত্যি।" তখন শশী তাহা নিঃশেষ করিল।

সে দিন সমস্ত রাত্রি শশী নেশায় অভিভূত হইয়া রহিল।

অন্য দিনের মত সুভা তাহার বিষ উদ্গীরণ করিতে লাগিল; কিন্তু সে দিন আর তাহা কাহাকেও দগ্ধ করিতে পারিল না। সে দিন উগ্রতর গরলের তেজে শশিভূষণ সুভার বিষ ব্যর্থ করিয়া দিল।

এ অমৃতের নেশা শশী ত্যাগ করিতে পারিল না। যে তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও সংসারের জ্বালা ভুলাইয়া দেয়, সে তাহার পরম মিত্র! তাই প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে যখন দীর্ঘ রাত্রির ভবিষ্য কাহিনী শাণিত তরবারির মত তাহার মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িত, তখন সে সাদরে তাহার সুধা পান করিত।

৪

মাসান্তে শশী সুভার হাতে ছয়টি টাকা আনিয়া দিল।

টাকা দেখিয়া সুভা বলিল 'আর ছ'টাকা? বারটি বইত টাকা নয়, তাও আবার সব নয়, এও না দিলেই ত হ'ত! কোথায় গেল বাকি টাকা?'

আঘাতের পর, আঘাত পাইয়া শশীর হৃদয়ও আজ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। সে স্থির করিয়াছিল আর যাহাই হউক, সে আজ আর মিথ্যা বলিবে না, সত্য কথা তাহার জন্য যদি তীব্রতর অভিশাপ বহন করিয়া আনে সে তাহাই গ্রহণ করিবে; তাই কোন ভূমিকা না করিয়া বলিল,—

'বাকি টাকায় মদ খেয়েছি।'

বজ্রাহতের মত চমকিত হইয়া সুভা কহিল 'মদ খেয়েছ কেন?'

শশী স্থির করিয়াছিল সব কথা খুলিয়া বলিবে, বলিবে, 'পিশাচি তোর জন্য, তুই যদি মানুষ হইতিস ত এই বার টাকায় আমরা রাজার মত সুখে থাকিতাম'। কিন্তু সবটা বলিতে পারিল না, শুধু বলিল, 'তোমার জন্যে—'

সুভা নিজের বিছানা ছুড়িয়া ফেলিল এবং মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, 'আমি তোমার কি কল্লাম, আমার নামে এ কলঙ্ক কেন? এত বড় দুর্ণাম দেবার আগে আমাকে মেরে ফেল্লে না কেন? ওগো আমার কি দোষ গো—' ইত্যাদি।

খানিক পরে উঠিয়া সে শশীর নিকট গেল, বলিল, 'দিব্বি কর কাল আর মদ খাবে না, কাল থেকে ছেড়ে দেবে।'

শশী বলিল 'হাঁ দিব্বি কচ্চি।'

তাহার পরদিন সন্ধ্যাকালে শশী যখন ঘরে আসিল তখন সুভা দেখিল সে আবার মদ খাইয়াছে। সে দিনও সুভা তাহাকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিল, এবং পূর্ব্বেরই মত শশী প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর সে এমন কাজ করিবে না।

তাহার পর সমস্ত দিনটা তাহার প্রতিজ্ঞার কথা মনে রহিল; কিন্তু যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, তখন যেন একটা মহাদৈত্য জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া, মদের দোকানের সামনে দাঁড় করাইয়া দিল, এবং সে অনন্যোপায় হইয়া সেই দোকানে প্রবেশ করিল। যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন পৃথিবীর সুখ দুঃখ তাহার নিতান্ত তুচ্ছ মনে হইতে লাগিল।

৫

এমনি করিয়া আরো পাঁচ ছয় দিন গেল।

সে দিন যখন শশী আবার মদ খাইয়া আসিল, তখন সুভা তাহাকে অত্যন্ত ভৎর্সনা করিল, বলিল, 'তোমার লজ্জা করে না। একে ত তুমি নিজে অপদার্থ, তাহার উপর নিজেকে এমন করিয়া পশু করিয়া ফেলিতে তোমার এতটুকু সঙ্কোচ বোধ হয় না? তুমি ভদ্রসন্তান, তার উপযুক্ত কি

এই ব্যবহার? ছিঃ? তুমি যখন কিছুতেই আমার কথা শুনলে না, তখন তোমার দাদাদের ব'লে দেব, দেখি তাঁরা কি করতে পারেন।

সে দিন সমস্ত রাত্রি শশীর ঘুম হইল না। সে ভাবিতে লাগিল সুভা সত্যই বলিয়াছে! আমি শুধু দোষ করিয়াছি তাহা নয়, বাস্তবিকই পশুর মত হইয়া গিয়াছি; সামান্য একটা অভ্যাস, ইহার জন্য আমি আমার বংশে পর্য্যন্ত কলঙ্ক দিতেছি, এটুকু আমার বল নাই যে আমি তাহা ত্যাগ করি। আর যদি সুভা দাদাদের বলিয়া দেয়— আর তাঁহারা আমাকে তাড়াইয়া দেন—তাহা হইলে? হয় ত ভগবানের ন্যায়বিচারে আমিই দোষী স্থির হইব!— দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

শেষ রাত্রে শশিভূষণ ধীরে ধীরে আপনার শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল, সুভার বিছানার নিকট গিয়া বলিল, 'সুভা, জেগে আছ?'

সুভা উত্তর করিল, 'হাঁ।'

খানিকটা থামিয়া শশী বলিল, 'সুভা, আমাকে বিশ্বাস কর, তোমার গা ছুঁয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আর মদ খাব না।'

সুভা খানিকটা সরিয়া গিয়া বলিল, 'ঢের হয়েছে, যে মদ খায় সে আবার আমার গা ছুঁতে আসে কোন্ লজ্জায়! তুমি ত রোজই প্রতিজ্ঞা কর, সে ত আর নূতন কথা নয়।'

কোনরূপে চোখের জল নিবৃত্ত করিয়া শশিভূষণ বাহিরে চলিয়া গেল, তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই।

৬

তৃতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রের পাণ্ডু কিরণ বারান্দায় সুভার মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। আজ সমস্ত দিন শশিভূষণ

একবারও বাড়ীতে আসে নাই। তাই বোধ হয় শশীর জন্য আজ সুভার মন কেমন করিতেছিল! শশীর জন্য সুভার মন যে এতটুকু ব্যাকুল হইতে পারে, আজিকার সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুভা সে কথা কখন বোঝে নাই, সহসা এই অনুজ্জ্বল জোৎস্নার ভিতর সে নিজের কেমন একটা অভাব বোধ করিতে লাগিল! আজ সে শশীর দাদাদের মদ খাওয়ার কথা বলিয়া দিয়াছিল, শঙ্কা হইতে লাগিল, আবার যদি সে মদ খাইয়া আসে, না জানি তাঁহারা কি শাস্তি দিবেন। আর যদি না খায়! সুভার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। 'হে ঠাকুর তাই যেন হয়— '

এমন সময় পার্শ্বে ছায়া পড়িল; সুভা দেখিল শশিভূষণ টলিতে টলিতে আসিতেছে।

সুভা তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'আবার আজ খেয়েছ।'

শশিভূষণ ঘাড় নাড়িল, 'না সুভা আজ আর খাইনি; তোমাকে ছুঁতে দেও, তোমার কোলে মাথা রাখতে দেও বলছি।'

ক্ষুদ্র বালকের মত শশীকে নিজের বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া সুভা কহিল, 'আঃ, খাওনি ত?'

শশী জোর করিয়া চাহিয়া বলিল, 'না আজ আর খাইনি। সন্ধ্যাবেলা তৃষ্ণা যখন আকণ্ঠ হয়ে এল—তখন সুফা!'—

শশীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুভা কহিল, 'তখন?'

ধীরে ধীরে চ'খ বুজিয়া শশী কহিল, 'বিষ খেয়েছি।'

শুনিয়া সুভা চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছা গেল; এবং সেই শব্দে যখন শশীর দাদারা শশীকে ভৎর্সনা করিতে ছুটিয়া

আসিলেন, তখন সে অস্তমান চন্দ্রের শেষ পাণ্ডুর কিরণে তাহার উপেক্ষিত জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনীটুকু শেষ করিয়া ফেলিয়াছে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,
৭নং মাণিক সরকার্‌স্‌ রোড, ভাগলপুর।

একাদশ বৎসরের প্রথম পুরস্কার।

রাখীবন্ধন।

১

পিতাপুত্রে কখনও বনিবনাও হইত না। অধিকাংশ সময়েই দেখা যাইত পিতা দুর্গাচরণের মতের সহিত পুত্র আশুতোষের মতের আদৌ মিল হইত না। অধিকন্তু, লেখা পড়া শিখিয়াও কেন যে তাঁহার পুত্র আর্ত্তনাদ ও দীনদরিদ্র ব্যক্তিদিগের সহিত মিশিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিত, তাহা তিনি ভাল বুঝিতে পারিতেন না। এ জন্য দুর্গাচরণকে প্রায়ই আত্মীয় স্বজন ও পাড়ার লোকের কাছে দুঃখ করিতে দেখা যাইত। ধৈর্য্যশীল আশুতোষের এ সব গা-সহা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ যখন তাহাদের জমীদারীর প্রজারা প্রভাতে আসিয়া করুণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া আশুতোষের দ্বারা দুর্গাচরণকে জানাইল যে তাহারা দুর্বৎসর হেতু এবারে জমীর খাজনা দিতে পারিবে না, তখন আর্ত্ত প্রজাগুলির উপর পিতার দুর্ব্যবহার দেখিয়া সে একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। নিতান্ত কর্ত্তব্য-বোধে দুই একটী কথা কহিয়াছে মাত্র, এমন সময় দুর্গাচরণ বলিয়া উঠিলেন, "আজকাল লেখা পড়া শিখিয়া তোমাদের ত্রৈ হইয়াছে বাপু, কেহ কোন দুঃখ জানাইয়া কিছু প্রার্থনা

করিলে, তোমাদের চাঁদার খাতায় নাম সহি করিবার ও অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতাটী বিলক্ষণ হইয়াছে, বিশেষ তোমার ত পাত্র বোধে কখন কার্য্য করা— ”

দুর্গাচরণ ক্রুদ্ধ হইলে তাহার উচ্চারিত বাক্যের স্বচ্ছন্দ গতি দেখা যাইত না। সে কারণে এবারকার বক্তব্যটাও শেষ করা হইল না। অবসর বুঝিয়া আশুতোষ জানাইয়া দিল যে প্রজারা যাহা বলিতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। দেশের অবস্থা পিতার জ্ঞাত থাকাই সম্ভব, পজাদের খাজনাটা এবারে মাপ করিয়া দেওয়া হউক।

পিতাপুত্রে কথাবার্ত্তা অতি কমই হইত। কিন্তু দুর্গাচরণ কথাবার্ত্তায় কোন বিষয়ে যদি পুত্রের তিল মাত্র অনৈক্য বুঝিতে পারিতেন, তখন কথাবার্ত্তা অন্যরূপ ধারণ করিত। আশুতোষকে লক্ষ্য করিয়া তিনি অনেক কথা শুনাইয়া দিতেন। এবারেও তাহা বাদ গেল না। অতিরিক্ত রাগের ঝোঁকে শেষে তিনি আশুতোষকে বলিয়া উঠিলেন, 'নিজে তুমি কখনও কিছু উপার্জ্জন কর নাই, আমার আয় ব্যয় সম্বন্ধে তোমার কথাবার্ত্তা নিতান্তই অশোভন দেখায়। আমি যাহা ভাল বুঝিব, তাহাই করিব। তুমি আপনার লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত আছ, তাহা লইয়াই থাক।”

আশুতোষের প্রতি দুর্গাচরণের এরূপ কঠোর উক্তি তাহার মনে গিয়া অত্যন্ত আঘাত করিল। সে যে পিতার নিকট এরূপ ব্যবহার পাইবে, ইহা কখনও প্রত্যাশা করে নাই। যাহা স্বপ্নের অগোচর ছিল, বাস্তব জীবনে তাহা লাভ করিয়া সে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত

করিয়া সে ত বরাবরই পিতাকে স্বীয় উপার্জ্জনের কথা বলিয়া আসিয়াছে। বাল্যকাল হইতে আশুতোষের ইচ্ছা ছিল যে নিজের সমগ্র উপার্জ্জিত ধনে অক্ষম ও দীনদরিদ্রদিগের যথাসাধ্য সেবা ও সাহায্য করিবে। কিন্তু দুর্গাচরণ আশুতোষের সে দিকে কোনও প্রকার মনোনিবেশ যে আদপে পছন্দ করিতেন না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হই যাছে। পুত্র একটু বড় হওয়া অবধি তিনি বরাবরই তাহাকে এ বিষয়ে বাধা দিয়া আসিয়াছেন। বড়লোক জমীদারের পুত্র হইলে কিরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতে হয়, সে বিষয়ে তাঁহার আদর্শ আশুতোষের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল।

তাই আজ যখন দুর্গাচরণ আশুতোষকে কঠিন কথাগুলি শুনাইয়া দিলেন, তখন সে আজ আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না। পিতার অনলশ্রাবী মন্তব্য শেষ হইলে সে জানাইল যে প্রজাদের রক্তশোষণ করিয়া তাহাদের লুণ্ঠিত ধনে তাহার স্পৃহা আদৌ নাই। দুর্ব্বৎসরে প্রজাদের নিকট খাজনা আদায় করা হত্যার নামান্তর মাত্র, সে বুঝিয়াছে। একমাত্র মাতৃহীন পুত্র ননীগোপালকে লইয়া সে আজই অন্যত্র গিয়া থাকিবে। অনবরত কলহের মধ্যে থাকা অপেক্ষা দূরে শান্তিতে জীবন যাপন করা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। উভয়েরই মন ইহাতে ভাল থাকিবার সম্ভাবনা।

পিতার অনুমতি পাইলে, আশুতোষ আপনার পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র ননীকে লইয়া নগর ত্যাগ করিয়া দুই ক্রোশ দূরে একটি গ্রামে গিয়া বাসা লইল।

২

আশুতোষ যে গ্রামটীতে গিয়া বাসা লইয়াছিল, সে গ্রামে তাহার সহপাঠী যতীশ নামে এক পুরাতন বন্ধু

থাকিত। চেষ্টা চরিত্র করিয়া সে আশুতোষকে গ্রামের স্কুলে একটা মাষ্টারী জুটাইয়া দিল।

এই মাষ্টারীটা পাইয়া আশুতোষ অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিল। পিতার নিকট যখন সে ছিল, লেখা পড়ার চর্চ্চায় ও একরূপ নিশ্চেষ্টতায় তাহার জীবন কাটাইতে হইত। অধুনা কর্ম্মের আস্বাদন পাইয়া পূর্ব্বের বন্ধন-ভারগ্রস্ত জীবন অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইতেছিল। অধিকন্তু স্কুলে অধ্যাপনার পর সে যে সময়টী পায়, তখন সে আপনার চিরপোষিত অভিলাষটী পূর্ণ করিবার প্রয়াস পায়। কোথায় কোন দুর্ভিক্ষ পীড়িত দরিদ্রের কি অভাব, গ্রামে কাহার কি অসুবিধা, তাহা দুর করাই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। বন্ধনমুক্ত জীবনে যে এত আনন্দ সে পূর্ব্বে জানিত না।

গ্রামের দীন দরিদ্র সকলেরই নিকট আশুতোষের প্রশংসা ধরিল না।

৩

পুত্রকে বিদায় দিয়া দুর্গাচরণ যে বিশেষ মানসিক কষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। বরং তাঁহার এরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, এখন তিনি যে সব কার্য্য করিবেন, তাহাতে বাধা দিবার লোক কেহ থাকিবে না। স্বেচ্ছামত কার্য্য বাধাবিহীন ভাবে করিলে যে একটা বিপুল আনন্দ পাওয়া যায়, এতদিন তিনি যেন তাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন। আশুর বিদায়ের পর তিনি আপনাকে অনেকটা স্বচ্ছন্দ মনে করিলেন।

কিন্তু একটী ছোট শিশুর স্মৃতি তাঁহার সকল কার্য্যের ও ব্যস্ততার মধ্যে তাঁহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। পৌত্র-বিরহে তাঁহার হৃদয়ে যে বেদনা ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল,

তাহার অন্ত তিনি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। ননী চলিয়া যাইবার পর দুর্গাচরণের গৃহে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিল। তাহাকে বিদায় দিয়া বুঝিতে পারিলেন যে একটী সুগভীর নিরানন্দ ভাব সমগ্র বাটীটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্ব্বে যে বাটীতে শিশুর কলরব ও চাঞ্চল্যের বিরাম ছিল না এখন সে বাটীতে এই শান্তিপূর্ণ নীরবতা ও শব্দবিহীন শূন্যতা অনুভব করিয়া দুর্গাচরণের মন কাতর হইয়া পড়িত।

তিনি আপনার কর্ম্মের মধ্যে, গৃহের মধ্যে কিছুতেই আর বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন না। প্রাতে জমীদারী সম্বন্ধীয় কাগজপত্র দেখিবার সময় দেখিতেন যে চসমাটী পূর্ব্বদিনে যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন ঠিক সেই স্থানেই আছে। তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার লোক এখন আর কেহ নাই। অগোচরে দোয়াত ও কলম লইয়া পলাইবে এমন লোকও আজকাল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পূজা করিবার সময় ফুল চুরি করিয়া লইয়াও কেহ পালায় না। দুর্গাচরণের স্নানাহারও এখন নিতান্তই সঙ্গীবিহীন ভাবে করিতে হয়। নিজের খাইবার সময় ননীর খাওয়া হইয়াছে কি না ভাবিয়া চিত্ত আকুল হইয়া উঠে। তাহাকে না খাওয়াইয়া তাঁহার কখন আহারে পরিতৃপ্তি হইত না। আজকাল সে কথা স্মরণ করিয়া নয়নপ্রান্ত আর্দ্র হইয়া উঠে।

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে দুর্গাচরণ একাকী যখন আপনার ঘরে প্রবেশ করিতেন, তাঁহার এক একবার হঠাৎ মনে হইত যেন দ্বারের আড়াল হইতে পরিচিত স্বরে, "দাদামশাই —টু" শব্দ শুনিতে পাইবেন। যদিও দুর্গাচরণ জানিতেন যে চারিদিক খুঁজিলেও কাহাকেও পাওয়া যাইবে না, তবুও

তাঁহার চক্ষু দুইটী একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিত। দর্শনান্তে তাঁহার চক্ষুপ্রান্তজলে ভরিয়া আসিত, ভাবিতেন, "কোথায় রে ননী, তুই আজ কোথায় গিয়েছিস, কোথায়?" সে যে গৃহে নাই, পথে নাই—সে যে তাঁহার অশ্রু অভিষিক্ত হৃদয়টী অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেন না!

ননী চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে দাদা মশাইয়ের নিকট শয়ন করিত। আজকাল বৃদ্ধ একাকী শয্যায় শয়ন করেন। বিছানার পার্শ্বের স্থানটী শূন্য দেখিলে শয্যায় বেশীক্ষণ থাকিতে পারেন না; প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। নিশীথ রাত্রে বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসেন। নিশীথিনীর অন্ধকারে অনুভব করেন যেন তাঁহারই অব্যক্ত বেদনা অগণ্য নক্ষত্রমণ্ডলীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে!

৪

দুর্গাচরণকে ছাড়িয়া আসা অবধি ননীরও মন আদপে ভাল ছিল না। দাদামশাইকে ছাড়িয়া কখন্ যে নূতন বাটীতে উঠিয়া আসিয়াছে সে জানিতে পারে নাই। একদিন হঠাৎ ঘুমের পর জাগিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখে যে নূতন একটী ঘরে সে শুইয়া আছে। শয্যার পার্শ্বে দাদামশাই নাই, কিন্তু তাঁহার পরিবর্ত্তে বাবা সে ঘরে একাকী বসিয়া পার্শ্বের একটী টেবিলে বই রাখিয়া পড়িতেছেন। আশুতোষকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে জানিতে পারিল যে তাহাদের দুইজনকেই এখানে থাকিতে হইবে। দুর্গাচরণের সহিত ননীর সাক্ষাৎ হওয়া যে আর সম্ভব নহে, সে কথা আশুতোষ আর ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। কিন্তু কি জন্য যে ননীর প্রতি এরূপ কঠিন শাস্তি বিহিত হইল, ক্ষুদ্র শিশু জীবনে সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। দুর্গাচরণকে

ছাড়িয়া আসা পর্য্যন্ত তাহার বড় মন কেমন করিতে লাগিল।

খেলায় ও সর্ব্ববিষয়ের সাথী দুর্গাচরণকে ছাড়িয়া পুত্র ননীগোপালের যে কতদূর কষ্ট হইবে তাহা বুঝিতে পারিয়া আশুতোষ পূর্ব্ব হইতেই তাহার জন্য খেলনা ও নানাবিধ ছবির বহি ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। ননী মধ্যে মধ্যে তাহা লইয়াই একাকী ব্যস্ত থাকিত কিন্তু খেলাব মধ্যেও সে এক এক দিন অকস্মাৎ গম্ভীর ও বিষণ্ণ হইয়া উঠিত। আশুতোষ তাহা লক্ষ্য করিতেন। তিনি তখন আপনার স্নেহক্রোড়ে তাহাকে টানিয়া লইয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন।

৫

ইহার মধ্যে একটা নূতন ঘটনা হইয়া গিয়াছে। শ্বশুর বাটী হইতে ননীর দিদি নলিনীবালা পূজার পূর্ব্বে বাটী আসিয়াছে। সে-ই এখন ননীকে অনেক সময় ভুলাইয়া রাখে। গল্প বলিয়া, ছবির বহি দেখাইয়া তাহাকে আনন্দ-বিহ্বল করিয়া তুলে। নলিনীর এই সবে দুই বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে; সে তাহার শ্বশুর বাড়ীর কত কথা ছোট ভাইটীকে বলে। সব কথা বুঝিত না, কিন্তু দিদির নিকট দ্রব্যাদি লইবার লোভে সে চুপ্ করিয়া সব শুনিয়া যাইত। চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলে নলিনী ধমক দিত, "যা, তোর আর গল্প শুনেও কাজ নেই, আর খেলনা নিয়েও কাজ নেই, সেই যে নতুন বাঁশীটা এনেছি, তা' আর কাউকে দিলেই হ'বে, তুই ত নিবিনি'!"

একটা ফুৎকারে যেমন দীপ হঠাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তেমনি ননীর মুখ অকস্মাৎ মলিন হইয়া যাইত। দিদি আবার তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া, আদর করিয়া নিজের ভাল

বাক্সটী খুলিত। যে জিনিষটা লইবে তাহা ননীকে নিজেই নির্ব্বাচন করিয়া লইতে বলিত।

এক দিন এইরূপ করিয়া নলিনী ছোট ভাইটীকে ভুলা-ইতেছে, এমন সময় ননীর দিদির বাক্সের ভিতর যত্নে রক্ষিত "কুন্তলীন" ও "দেলখোস" শিশি দুইটীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। সে দেলখোসের শিশিটী হাতে লইয়া নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এতে কি দিদি?" দিদি কহিল, "ওর নাম দেলখোস, রুমালে মাখতে হয়, খুব ভাল ফুলের গন্ধ এর ভেতর। আর এই যে এটা, এটা মাখলে চুল খুব বড় হয়। তুই নিবি?" দেলখোসের শিশিটী হাতে লইয়া ননী বলিল, "আমি শুধু এটা নেব।" শিশিটীর গন্ধের আঘ্রাণ লইয়া সে তাহা পুনরায় দিদির বাক্সের ভিতরই রাখিয়া দিল।

এমনই করিয়া উভয়ের দিন কাটিয়া যাইত। আশুতোষ আপনার কার্য্যে দিন রাত্রি নিমগ্ন থাকিতেন। কন্যা নলিনী আসা অবধি তিনি ননীগোপালের আর কোন খোঁজ খবর লওয়া আবশ্যক মনে করিতেন না।

৬

দাদামশাইকে এ কয়দিন আর ননীর মনে পড়ে নাই। কিন্তু যখন পূজার কথা সে শুনিল, তখন তাহার মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই পূজার সময় তিনি কত জিনিস তাহাকে দিতেন, কত আদর করিতেন, সব কথা মনে পড়িয়া গেল।

কিন্তু সে পূজাও হইয়া গেছে। এত আশা করিয়াও দাদামশাইয়ের সহিত দেখা না পাইয়া ননীর মন বড় খারাপ হইয়া গেল। দাদামশাইয়ের কথা দিদি ও বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর পায় না। দিদি নাকি আবার বলিয়াছে যে দাদামশাই তাহাদের উপর রাগ

করিয়াছেন। তাই সে এখন দিদির সহিত তেমন করিয়া হাসিয়া কথা কহে না। এমন কি গল্প শুনিতে তাহার আজকাল তেমন আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না।

নলিনী তাহাকে অনেক প্রকারে ভুলাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু পারিত না। এমন সময়ে সে আশার একটা উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইল।

যে সময়ের কথা লিখিতেছি তাহার সহিত ইতিহাসের একটু সম্পর্ক আছে। যে ঘটনাটী লিখিতেছি, সেই ঘটনার পূর্ব্বের বৎসরে বঙ্গবিচ্ছেদ হইয়া গেছে। তাহারই বাৎসরিক দিনে ননীদের গ্রামে যে রাখীবন্ধন, সঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি হইবে, তাহার বিষয়ে নানা প্রকার গল্প করিয়া নলিনী ভ্রাতাকে হর্ষোল্লাসে সঞ্জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিত। ননী নানারূপ প্রশ্ন করিত। একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দিদি 'রাখীবন্ধন' কা'কে বলে ?" নলিনী রাখী বন্ধনের উদ্দেশ্যটী ছোট ভাইটীকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল। বলিল, "সে দিন ভা'য়ে ভা'য়ে ভাব করিতে হয়। ভাই যদি রাগও করেন, তবুও সব ভুলিয়া তাহার হাতে রাখী পরাইয়া দিতে হয়।"

দিদির নিকট রাখীবন্ধনের এই কথা শুনিয়া অবধি তাহার মনে একটা ভারি মজার কথা মনে হইত, কিন্তু সে কথা দিদিকে প্রকাশ করিয়া জানাইত না।

৭

রাখিবন্ধনের দিনে আশুতোষ যখন গঙ্গাস্নান করিয়া অধিক বেলায় বাটী প্রত্যাগমন করিলেন তখন ভীত চকিতা নলিনীর মুখে শুনিলেন যে ননীকে কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সে নলিনীর সঙ্গে প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল, কিন্তু অর্দ্ধেক পথে গিয়াই সে বাটী ফিরিয়া যায়।

কয়দিন হইতে তাহার শরীর খারাপ বলিয়া সে গঙ্গাস্নান করিতে চাহে নাই। নলিনী বাটী আসিয়া দেখে ননী কোথাও নাই।

আশুতোষ চিন্তিত হইয়া থানায় খবর পাঠাইলেন ও নিজেও অনুসন্ধান করিতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু কোথায়ও ননীর খোঁজ পাওয়া গেল না।

৮

"দাদামশাই, ট।

বৃদ্ধ দুর্গাচরণ দ্বিপ্রহরে আহারান্তে বাহিরের ঘরের বিছানায় যেরূপ প্রত্যহ আসিয়া শয়ন করেন, আজও সেইরূপ শয়ন করিয়াছিলেন। আশু ও ননীকে বিদায় দিয়া তাঁহার মন যে এত খারাপ হইবে তিনি পূর্ব্বে ভাবেন নাই। সর্ব্বদাই মনে হইত যে পুত্র আশুতোষ ও তাঁহার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্র পড়িয়া আছে। পিতৃ গর্ব্ব ভুলিয়া তিনি যদি জয়ী হইতে পারেন, তবেই আশু ও ননী উভয়েই তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সে কথা স্মরণ করিলেই তাঁহার আশঙ্কা হয়। ফল কি হইবে কে জানে? তাঁহার পক্ষ হইতে জয়ের ত কোনও আশাই দেখা যায় না। পুত্র যেরূপ আত্মসম্মানপ্রিয় সে যে বাটী ফিরিয়া আসিবে এরূপ আশা দুর্গাচরণ কিছুতেই করিতে পারেন না।

আজ আহারান্তে শুইয়া শুইয়া তিনি এই সব কথাই মনের মধ্যে আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বরে আপনার নাম শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। সুমধুর শিশুকণ্ঠে ধ্বনিত পরিচিত আহ্বানবাণীটী হইতে তিনি অনেক দিন বঞ্চিত ছিলেন।

দাদামশাইকে ডাকিয়া ননী আপনার হস্ত দুইটী পিছনে

রাখিয়া অপরাধীর ন্যায় দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল। ভিতরে যাইবার তাহার সাহস কুলাইতেছিল না। যদি দাদামশাই বকেন। তাই অতি ভয়ে ভয়ে, ধীবে ডাকিল, "দাদামশাই, টু।"

দুর্গাচরণ বজ্রচকিতে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িলেন। পূর্ব্বে এক এক দিন মনে হইত বটে যেন পবিচিত শিশুকণ্ঠে কে যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে, কিন্তু আজ আর কোন ভুল নাই। বৃদ্ধ শয্যা ত্যাগ কবিয়া ননীকে ক্রোড়ে তুলিয়া আপনার শয্যায় আসিয়া বসিলেন। বুকে জড়াইয়া ধবিয়া, চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে অস্থিব করিয়া দিলেন।

ননী আব কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া দুর্গাচবণকে প্রথমেই প্রশ্ন করিল, "দাদামশাই, তুমি আমার ওপব রাগ কর নি?" দুর্গাচরণ আপনাব কম্পিত হস্ত তাহার ক্ষুদ্র মস্তকটীর উপরে রাখিয়া বলিলেন, "না দাদা, আমি কি তোমার ওপর রাগ কর্ত্তে পারি?"

"তবে কেন তুমি আমাদের বাড়ী পূজোর সময় যাও নি?"

চক্ষের জলে বৃদ্ধ ঠিক মনোমত উত্তর খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। মনে মনে বলিতেছিলেন, "দাদা, আমি যা' পারিনি', তুই আজ তাই করেছিস্!" তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। কোনও কথা তিনি বলিতে পারিলেন না।

দাদা মশাই, এই দেখ তোমার জন্যে আজ্‌কে আমি কি এনেছি!", এই বলিয়া ননী তাহার জামার পকেট হইতে শিউলি ফুলের বোঁটায় নিজ হস্তে রঞ্জিত একটী রাখী বাহির করিয়া স্নেহ সুকোমল হস্তে দুর্গাচরণের শীর্ণ হস্তে পরাইয়া দিল। অপর পকেট হইতে ক্ষুদ্র একটী শিশি বাহির করিয়া সে শয্যার উপর রাখিয়া দিল।

"দাদামশাই, তুমি বড় ফুল ভালবাস, এই দেখ কেমন একটা শিশি এনেছি। এব ভেতর কেমন ফুলের গন্ধ! দিদি বলেছে, আজকের দিনে সবাইকে দিশি জিনিস দিতে হয়। তোমাকে দেবাব জন্যে আমি এটা এনেছি। তুমি আমাকে এবার পূজোর সময় কিছু দাও নি——"

এক নিঃশ্বাসে ননী এই কথা কয়টী বলিয়া গেল। এতদিন আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে দারুণ অভিমান লুকাইয়া বাখিয়াছিল, আজ সে অভিমান আর কিছুতেই গোপন বাখিতে পারিল না। রুদ্ধোচ্ছ্বাস নির্ঝরের ন্যায় বালকের চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। সে ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

দুর্গাচবণ অনেক কবিয়াও তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিলেন না। অবশেষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে দুর্গাচরণের ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

৯

ননীগোপাল যে দিন তার দাদামশাইয়েব সহিত দেখা কবিতে যায়, সে দিন তাহার কিছুই আহার হয় নাই। আশুতোষ ও নলিনীর অগোচরে সে প্রত্যুষেই নগরের দিকে যাত্রা করিয়াছিল। পথ না জানায় ও রৌদ্র উঠায় কিছুদূর অবধি গিয়া সে আব হাঁটিতে পারে নাই। রাস্তার ধাবে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে কাঁদিয়াছিল। অবশেষে এক জন ভদ্রলোক দয়া পরবশ হইয়া নিজের গাড়ী করিয়া প্রিয়দর্শন বালকটীকে দুর্গাচরণের বাটীর নিকট নামাইয়া দিয়া চলিয়া যান। কয়দিন হইতে ননীর শরীর ভাল ছিল না। আজ দ্বিপ্রহরে রৌদ্র লাগিয়া তাহার মাথা ব্যথা করিতে লাগিল।

দুর্গাচরণ দেখিলেন, ননীর জ্বর হইয়াছে। সন্ধ্যামুখে বালকেব জ্বর শীঘ্র বাড়িয়া উঠায় তিনি ডাক্তার ডাকিতে

লোক পাঠাইয়া দিলেন। নিজে শয্যার পার্শ্বে ননীর ক্ষুদ্র দুইটী হস্ত আপনার হস্তে তুলিয়া লইয়া একাকী বসিয়া রহিলেন।

যথাসময়ে ডাক্তার আসিয়া রোগীকে দেখিয়া ঔষধ লিখিয়া চলিয়া গেলেন। আশার কথা তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না।

বেশী রাত্রে প্রলাপের লক্ষণ ক্রমশঃ দেখা দিল। বালক তখন ভুল বকিতে আরম্ভ করিল।

"দাদামশাই তোমার হাতটা একবার এগিয়ে দাও না, রাখীটা পরিয়ে দিই। আমার উপর তুমি রাগ কর নি"

প্রভাতে কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ননী কাহার প্রত্যাশায় ঘরের চারিদিকে চাহিয়া রহিল। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সে পুনরায় নীরবে চক্ষু বুজিয়া শুইল।

দুর্গাচরণ আশু ও নলিনীকে আনিতে পূর্ব্বেই লোক পাঠাইযাছিলেন। দ্বিপ্রহরে ডাক্তার আসিযা বালকের অবস্থা ভাল নহে বলিয়া গেলেন।

সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আশু ও নলিনী যখন আসিযা পৌঁছিল, তখন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় ননী আর একবার সচেতন হইয়াছে।

নলিনীকে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "দেখ দিদি, দাদামশাই আর আমাদের ওপর রাগ করবেন না বলেচেন, তাঁর সঙ্গে আমার ভাব হ'য়ে গিয়েছে, দেখ, কেমন তাঁর হাতে আমি রাখী পরিয়ে দিইচি—"

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার,
ভাগলপুর।

দ্বাদশ বৎসরের প্রথম পুরস্কার।

উপেক্ষিতা।

ছেলেবেলা হইতে বৃদ্ধ লালা আনন্দরাম মোক্তারকে আমাদের বাটীর সম্মুখে একখানি জীর্ণ চালায় বাস করিতে দেখিয়া আসিতেছি। যখন আমি ছোট ছিলাম তখন সে আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া মিঠাই দিত, এবং আধ' বাঙ্গলায় তাহার আদি বাস স্থানের গল্প বলিত, সেখানকার কোন নদী কোন পাহাড়ের গা দিয়া কেমন করিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, তাহার পাড়ে কোন কোন গ্রাম অবস্থিত, তাহার বাড়ীর কাছে কোন প্রতিবেশীর বাস, চার বৎসর পূর্ব্বে যখন সে দেশে গিয়াছিল, তখন তাহারা কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিল, এবং তাহার শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত এই যে সুখে দুঃখে সুদীর্ঘ জীবনটাকে সে শেষ করিয়া ফেলিবার মত করিয়াছে তাহার আরও কত কি কথা। তাহার পর তাহার চসমার পুরু কাঁচ সাফ্ করিতে করিতে সে তাহার ছেলের কথা পাড়িত। তাহার একমাত্র পুত্র যখন আমারই বয়সী হইয়া উঠিয়াছিল, যখন তাহার খ্যাতি ইস্কুলের সীমা ছাড়াইয়া প্রতিবেশীর মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়ে একদিন সে আষাঢ়ের এক মেঘ-কৃষ্ণ দিবসে বৃদ্ধের জীবনকে আঁধারতর করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বলিয়া আনন্দরাম নির্ব্বাক ভাবে দুলিতে থাকিত, এবং আমি দেখিতে পাইতাম

তাহার চ'খ দুটা জলে ভ'রে উঠিয়াছে! তাহার পর বোধ হয় যখন তাহার মনে হইত তাহার অশ্রু নবীন শ্রোতার হৃদয়টিকে কতখানি ভাবাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে, তখন সে সূচনা-মাত্র না করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিত, এবং কহিত "তুমি খেলতে যাবে না?" এবং আমার উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত "লছ্মী ও লছ্মী!"

ছিপ্‌ছিপে গৌরবর্ণ মেয়ে লক্ষ্মী ধীরে ধীরে তাহার পিতার কাছে আসিয়া কহিত "কি বাবা?"

আমার দিকে দেখাইয়া বৃদ্ধ লক্ষ্মীকে কহিত "তোর দাদাকে ডেকে নিয়ে যা' আজ তোরা খেল্‌বিনে?"

সে আজ কত দিনের কথা। আমি লক্ষ্মীকে এত ভালবাসিতাম যে শৈশবের সেই আনন্দোজ্জ্বল স্নেহকরুণ দিবসগুলিতে ভিন্ন বুঝি এত ভালবাসা আর কখনও যায় না! জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া ইস্কুল হইতে ফিরিবার পথে লক্ষ্মীর জন্য পুতুল কিনিয়া আনিতাম, ছবির বই কিনিয়া দিতাম আরও কত কি। একদিন দিদি আমাকে একশিশি কুন্তলীন দিয়াছিলেন, আমি তাহা পাইবা-মাত্র ছুটিয়া গিয়া লক্ষ্মীকে দিয়াছিলাম, সেই ক্ষুদ্র শিশিটি পাইয়া তাহার মুখে আনন্দের যে নির্ম্মল হাসি ফুটিয়া উঠিযাছিল, তেমন হাসি আর কখনও দেখি নাই!

সন্ধ্যার সময় খেলা শেষ করিয়া আমি বাড়ী যাইতাম এবং লক্ষ্মী তাহার পিতার বসিবার ঘরে দীপ জ্বালিয়া দিত। সন্ধ্যার সময়ে সেখানে বহু প্রতিবেশী আসিত, এবং বৃদ্ধ তাঁহাদের হাতে এক একটি বাদ্য যন্ত্র দিয়া গীত আরম্ভ করিত। রঘুজীর চরণ বন্দনা করিয়া আরব্ধ বৃদ্ধের সেই গীত শুনিতে শুনিতে সঙ্গীগণের নিকট সময়ের পার্থক্য দূর হইয়া যাইত, এবং মনে হইত আজ বৃদ্ধ একা নহে, পরন্তু

তাহার দেবতা শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে বসিয়া তাঁহারই বন্দনা গান গাহিতেছে, এবং ভক্তি যত গভীর হইয়া আসিতেছে ততই তাহার উচ্ছল হৃদয় আকুল, এবং কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিতেছে!

পরিবর্ত্তন বলিয়া পৃথিবীতে যে একটা অত্যন্ত দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, বৃদ্ধের শ্বেত-কেশ, কম্পিত-শিথিল হস্ত, নির্ব্বাক ভাবে তাহার প্রভাব স্বীকার করিত, এবং বৃদ্ধের কুঞ্চিত ললাটে তাহার বিজয় চিহ্ন দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু এই একান্ত দুর্লঙ্ঘ্য জাগতিক নিয়মকে বৃদ্ধ তাহার ভক্তি দ্বারা জয় করিয়াছিল। দিন দিন যখন অন্তিমের আঁধার ধীরে ধীরে তাহার উপর আসিয়া পড়িতেছিল, তখন সে প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাহার দেবতাকে বন্দনা করিয়া গান আরম্ভ করিত, এবং গান করিতে করিতে যখন তাহার দেহ ভক্তিতে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত তখন তাহার মনে হইত, সে যেন আজকার মানুষ নহে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার নববল, লাবণ্য যেন আজ তাহার দেহে ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং দর্শকদিগের চক্ষে প্রেমের আলোকে সে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

পূর্ণিমার আলোকে, অমাবস্যার গভীর অন্ধকারে, বসন্তের মলয় বাতাসে, শীতের কম্পনের ভিতর বৃদ্ধের গীত সমান ভাবে ধ্বনিত হইত, এবং বর্ষার ঘনঘোর মেঘে যে দিন দিগ্বিদিক আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত, এবং থাকিয়া থাকিয়া বজ্র নির্ঘোষ হইতে থাকিত, সে দিনও এই ভীষণ দুর্যোগের মাঝে বৃদ্ধের ভক্তিকরুণ কণ্ঠ অঞ্জলির নির্ম্মল পুষ্পের মত তাহার দেবতার পানে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে থাকিত।

এমনি করিয়া কতদিন গেল। দিবসের সমস্ত ঝঞ্ঝাট, লাঞ্ছনা, অপমান বৃদ্ধের এই শ্বেত মস্তকের উপর দিয়া যাইত, কিন্তু তবুও সে মস্তক অবনত হইত না। অবশেষে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার মৌনভাবে বিশ্বের উপর নামিয়া পড়িত, তখন বৃদ্ধের মস্তক তাহার কাল্পনিক দেবতার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িত।

লক্ষ্মী বড় হইয়াছিল, আমি আর তাহার সহিত খেলা করিতে যাইতাম না। যৌবনের প্রথম ধাপটিতে পা দিয়া সহসা অনাহূত ভাবে যে সঙ্কোচ, যে লজ্জা লক্ষ্মীকে বেড়িয়া ফেলিয়াছিল, তাহা আর সকলেই লক্ষ্য করিয়াছিল, কেবল করে নাই, তাহার এই বৃদ্ধ উদাসীন পিতা!

করে নাই, তাহার কারণ তাহার লক্ষ্মীর সহিত দিবসে একবার মাত্র সম্পর্কে আসিতে হইত, সে সন্ধ্যার দীপ জ্বালার সময়। লক্ষ্মী যখন সন্ত্রস্ত হইয়া সঙ্কোচে তাহার বসন দ্বারা দেহলতাকে বেষ্টন করিয়া দীপ হস্তে প্রবেশ করিত, তখন আনন্দরামের ভক্তি-সজল আঁখির সম্মুখে বহু-সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার সন্ধ্যান্ধকার গাঢ় বনের ভিতরকার দুইটি তরুণ তরণীর অপরূপ রূপ জাগিয়া উঠিত, এবং তখন সে আজকালকার পৃথিবী, ও তাহার তুচ্ছ সুখ দুঃখ হইতে বহুদূরে বিচরণ করিত।

লক্ষ্মীর মা অনুযোগ করিতেন "লক্ষ্মীর বিবাহের জন্য চেষ্টা কর না কেন? কোন হিন্দুস্থানীর ঘরের মেয়েকে এতদিন অবিবাহিত থাকিতে দেখিয়াছ কি? আনন্দরাম ধীর ভাবে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিত, "সবই শ্রীরামচন্দ্র জীউর ইচ্ছা, আমার লক্ষ্মীর বিবাহ কি নারায়ণ না জুটলে হয়; তুমি দেখতে থাক, একদিন না একদিন আমি লছমীর জন্যে নারায়ণ কে পাবই।"

* * * *

একদিন বৃদ্ধের সান্ধ্য বৈঠকে একটু বিশেষ আয়োজন দেখিলাম। ঘরটা অতিরিক্ত ধরণের পরিষ্কার এবং বৃদ্ধের ও তাহার সঙ্গীদের সাজসজ্জাতেও একটু নূতনত্ব দৃষ্ট হইল।

এবং তাহার পর তাহার যে তরুণ অতিথিটি আসিয়া বসিল, তাহার বেশ ভূষায় এবং আদর অভ্যর্থনায় তাহাকে বিশিষ্ট ধনী সন্তান বলিয়া বোধ হইল।

সে দিন বৃদ্ধের গান অনেকরাত্রি অবধি চলিল।

তাহার দু'দিন পরে বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলাম এমন সময় আনন্দরাম হাস্যমুখে আসিয়া কহিল "বাবু তোমাদের আশীষে লছ্মীর নারায়ণের মত বর পেয়েছি"—বলিয়া একটু থামিয়া আরম্ভ করিল "পরশু রাত্রে ফুলহাটের জমিদার বাবু আমার ঘরে পদার্পণ ক'রেছিলেন, কি ক'বে, জানিনে, নিশ্চয়ই রামচন্দর জীউর ইচ্ছেয়, সে আমার লছ্মীকে দেখে, দেখে তার বড় পছন্দ হ'য়েছে। তার এক সঙ্গী আমার কাছে বিবাহের কথা পেড়েছে—বর ঘর সব ভাল, তুমি কি বল বাবু,—তার সঙ্গে লছ্মীর বিয়ে কেন না দি'?" বলিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আমি তাহাকে বলিলাম "তুমি অনুসন্ধান ক'রে যদি এইরূপই বুঝে থাক, ত' এ বিবাহ ত' খুব বাঞ্ছনীয়।"

একমুখ হাসিয়া আনন্দরাম বলিল "বাবুজী, আশীষ কর, তোমার ছোটবোনটি যেন সুখে থাকে—রঘুনাথ যেন তার মঙ্গল করেন।"

তাহার কথার আমি কোনও উত্তর করিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয়ের আন্তরিক আবেদন লক্ষ্মীর মঙ্গলকামনায় ঊর্দ্ধে প্রেরিত হইল।

বৃদ্ধ চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার প্রতি পদক্ষেপে যে

আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তাহার দিন দশেক পরে আলো ও বাদ্য লইয়া, এবং দেলখোস ও পুষ্পের গন্ধে চারিদিক পরিপূর্ণ করিয়া ফুলহাটের জমিদার লছমীকে বিবাহ করিতে আসিল। আনন্দরাম কম্পিতকণ্ঠে, আর্দ্রনেত্রে তাহার করে আপনার প্রিয়তমা কন্যাকে সম্প্রদান করিয়া উভয়ের মাথায় হাত রাখিয়া বলিল "বাছা, তোমাদের শ্রীরামচন্দ্রজী মঙ্গল করুন, রঘুনাথ জীউর শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক।"

* * * *

বিবাহের পর ২।৩ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমি তখন সংসারে প্রবেশ করিয়াছি, ০ কর্মের ঝঞ্ঝাটে লক্ষ্মীর কথা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।

এমন সময় আনন্দরাম একদিন আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার মুখ আমি কখনও গম্ভীর দেখি নাই, কিন্তু সে দিন তাহাকে দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইল কিসের বেদনা যেন তাহার বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়াছে। আমাকে দেখিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল "বাবুজীর মঙ্গল ?"

আমি বলিলাম "হাঁ, তোমাদের সব কুশল ?"

বৃদ্ধ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "রঘুনাথজীউ জানেন।" তাহার পর খানিক থামিয়া হঠাৎ বড় বড় দুইটা চক্ষু আমার মুখের উপর রাখিয়া কহিল "বাবুজী, লছমীকে তোমার মনে পড়ে ?"

আমি হাসিয়া উঠিলাম "লক্ষ্মীকে মনে পড়বেনা মোক্তার সাহেব ? তাকে ভুলে গেলে যে আমার ছেলেবেলাটাকেই ভুলে যেতে হয়। সে কেমন আছে, মোক্তার জী ?"

আমার মুখের দিকে তেমনি করিয়া তাকাইয়া বৃদ্ধ বলিল "তারই কথা ব'লছিলাম। আজ তিনবছর তাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে গেছে একবারও ত' পাঠায় নি, তার উপর চিঠিও বড় বেশী পাইনে। গোড়ায গোড়ায় লছ্‌মী দু' একটা চিঠি দিয়েছিল, কিন্তু ভারি ছোট। তার পর আমার জামাই মাঝে মাঝে খবর দেয় তারা ভাল আছে—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু এই তিনমাস সে খবরও দেয়নি, আমি রোজ রোজ চিঠি দিচ্ছি তার উত্তর দেয় না। রামচন্দরজী যা করেন—বাবু আমার মন বড় খারাপ হ'য়ে গেছে। আমি ভাব্‌ছি একবার তাকে দেখে আসি।"

আমি বলিলাম "হাঁ, একবার দেখেই এস।" বৃদ্ধ চ'খের জল ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া কহিল "আর যদি তা'কে দেখ্‌তে না পাই?"

আমি সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম "হয়ত' একটা কোন বিশেষ কাজ এসে পড়েছে, তাই তোমাকে চিঠি দিতে পারেনি।"

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িল "বাবু রামচন্দর তোমার কুশল করুণ,—কিন্তু বুড়ার মন কিছুতেই মানচে না।"

সেই দিনই আনন্দরাম লক্ষ্মীকে দেখিতে গিয়াছে।

তার পর তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা সমস্ত আকাশ ঘনমেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল এবং দক্ষিণ হইতে শীতল বাতাস হু হু করিয়া বহিয়া আসিতে লাগিল। আজ সমস্ত দিনের কর্ম্ম-ক্লান্ত শরীর এই গাঢ় সন্ধ্যায় যেন একান্ত অবশ হইয়া উঠিল এবং মনের ভিতর যেন কোন অচিন্ত্য বেদনায় মুহুর্মুহু ব্যথিত হইতে লাগিল।

এমন সময় বৃদ্ধ আনন্দরামের গলা সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

"তুহার পদারবিন্দ ভরসা হামারি"

চকিতের মধ্যে আমার সমস্ত দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল, —আনন্দরাম ফিরিয়া আসিয়াছে,—লক্ষ্মীর খবর আনিয়াছে ত'! লক্ষ্মীর খবর? হাঁ তাই বটে, এই কয়বৎসরের পার্থক্য লক্ষ্মীকে আমার নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারে নাই, সুখের দিনে জানিতে পারি নাই, কিন্তু দুঃখের মেঘ যেদিন লক্ষ্মীকে ঘেরিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, সে দিন বুঝিলাম লক্ষ্মী আমার পর নহে—সে দিন লক্ষ্মী আমাব সম্মুখে ছেলেবেলাকার সেই খেলার সঙ্গীরূপে একান্ত আপনাব হইয়া অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল!

প্রায় ছুটিয়া বৃদ্ধের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম তাহার সঙ্গিগণ কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিয়াছে, কেবল আনন্দরাম উঠিয়া দাঁড়াইল, আমার হাত ধরিয়া বলিল "বাবু ব'স।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মোক্তার সাহেব লক্ষ্মীকে দেখিয়া আসিয়াছ? সে ভাল আছে ত?"

আনন্দরাম চকিতে আমাব দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ, খুব ভাল আছে" তাহার পর তাহার স্কন্ধে রক্ষিত তানপুরাটার উপর মাথা রাখিয়া হা—হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চ'খের জল মুছিতে মুছিতে কহিল, "সত্যি বাবু, এত সুখে সে কখনও থাকে নি। হতভাগা বুড়ো যে সুখ পেলে না, সে তাই লাভ ক'রেছে, রঘুনাথ জীউর শ্রীচরণ তলে সে স্থান পেয়েছে।"

ঊর্দ্ধে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল—তাহার পর চ'খের জল মুছিয়া কহিতে লাগিলঃ—

"যে দিন আমি ফুলহাটের জমীদারের স্ত্রী—আমার লক্ষ্মীকে দেখ্‌তে গেলাম, সে মোটে তিন চার দিনের কথা।

অত বড় জমীদার, তার স্ত্রী কেমন ঘরে ছিল জান ? বিশ্বাস ক'রবে না, একটা ভাঙ্গা বেড়ার ঘর, তাতে রোদ, হিম, কিছু আটকায় না। আমার লক্ষ্মী,—সোণার লক্ষ্মী সে তিন বছর সেই ঘরে একটি কথা না ব'লে কাটিযে এসেছে। ফুলহাটের ভাবী জমিদার বাবু— তিনি তাকে দাসী ব'লে পরিচয় দিয়েছিলেন—সে সেই অপমান নতমুখে সহ্য ক'রে এসেছে, একমাত্র ভগবানকে সে কথা জানিয়েছিল, আর কাউকে নয়—এমন আমাকেও না, পাছে আমি কষ্ট পাই—সেই ভয়ে। এমন মানুষ তোমরা দেখেছ ?

বলিযা আনন্দরাম দুই হাতের উপর মাথা রাখিয়া খানিকক্ষণ স্থির হইয়া বসিযা রহিল।

"আমি যখন গেলাম তখন দু'মাস অসুখের পর তার মুমূর্ষ অবস্থা। তার শীর্ণ পাণ্ডু মুখের ওপর ভাঙ্গা দেওয়াল দিয়ে পশ্চিম থেকে সূর্য্যের কিরণ এসে প'ড়েছিল, আমাকে দেখে সে আগে চিনতে পারে নি, তারপর যখন চিনতে পারলে, তখন আমার কোলে মাথা রেখে সে তিন বছরের মেয়ের মত কাঁদতে লাগল। তার সোণারবরণ কালি হ'যে গিয়েছিল, —একটা জীর্ণ বিছানায় তাকে শুইযে রেখেছিল। অনেক দিন পরে বাপেতে মেয়েতে একসঙ্গে বসে প্রাণ খুলে কাঁদলাম, তারপর ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে বলিলাম, "লছমী, চল একটা ভাল বাড়ী ভাড়া ক'রে তোর চিকিৎসা করাই, তুই সেরে উঠবি।' সে তার উজ্জ্বল চ'খ দুটো আমার পানে তুলে ব'ল্লে 'বাবা, আর আমার বেঁচে লাভ কি ? বেঁচে থাকলে আমি আবার আগেকার সুখ ফিরে পাব ? উপেক্ষিতা হ'য়ে দাসীর মত বাঁচার চেয়ে কি মরা ভাল নয় ? তুমি আমাকে যার হাতে সমর্পণ ক'রেছ, তিনি যদি না চান, তবে মরণের

দোর থেকে, কি সাধে কার কাছে ফিরে যাব---বাবা—'
আমি তখন কাঁদছিলাম তাই আমার দিকে চেয়ে ব'ললে,
'বাবা, তুমি কেঁদ না, তোমাকে আমি দেবতার মত জানি,
তোমার চ'খে জল দেখ্‌তে আমার ম'রতে সাহস হবে না,
আজ আমার দুঃখ রইল না, স্বামীর ঘরে স্বামীর শয্যায়,
সে যতই জীর্ণ হ'ক না, আমার বাবার পায়ের তলায় যদি
মরতে পারি, ত' সে মরণ সার্থক।'

"ডাক্তারের জোরে আমি তাকে দু'দিন বাঁচিয়ে
রেখেছিলাম ; আজ ভোর বেলায় ডাক্তার যখন ব'ল্লে আর
কিছুতেই বাঁচবে না তখন আমার সমস্ত শরীর রাগে কাঁপ্‌তে
লাগল, মনে হ'ল, যে তার এই রকম মৃত্যুর কারণ তাকে
খণ্ড খণ্ড ক'রে ছিড়ে ফেলে, বিদ্রোহী পৃথিবীর ওপর পাগলের
মত গিয়ে পড়ি, আমার ওপর এ অন্যায়েব প্রতিশোধ
নি ; আমি তখন পাগলের মত হ'য়ে গিয়েছিলাম, বোধ
হয় ডাক্তারকে ব'লেছিলাম ধর্ম্মে হ'ক, অধর্ম্মে হ'ক এর
প্রতিশোধ তুলবই, কেননা দেখ্‌লাম সে আমাকে শান্ত
হ'তে ব'লছে।

"তারপর আর অল্প বাকী। ডাক্তার চ'লে যাবার এক
ঘণ্টা পরেই আমার লছ্‌মীর উজ্জ্বল চ'খ নিদ্রাতুর হ'য়ে
আস্‌তে লাগলো, মুখের হাসি যেন ফুটে উঠ্‌তে লাগলো।
তার মুখের ওপর এলান' চুল এসে প'ড়েছিল, নিঃশ্বাস দুর্ব্বল
হ'য়ে আসছিল—আমি তখন মেজেয় প'ড়ে তার জন্যে
ভগবানকে ডাকিতে লাগলাম, হে রঘুনাথ, তাকে ফিরিয়ে
দেও, আমার আর সব নাও! আমি আর কিছু চাইনে,
শুধু লছমীকে দেও,—আমি আমাকেও চাইনে!

"দেবীর স্বরে---কেন না লছ্‌মী তখন বৈকুণ্ঠের কাছে
গিয়েছিল—দেবীর স্বরে লছ্‌মী আমাকে ডাক্‌লে 'বাবা।'

শ। তাড়াতাড়ি তার মুখের কাছে কান নিয়ে গেলা, . . .আমার দুই হাত ধ'রে বল্লে 'বাবা, প্রতিশোধ নয়, ক্ষমা ক'রো।' এ সুর মানুষের নয়—বুড়ো আনন্দ-রামের মেয়ের নয়! আমি তার কপালে একশ' বার চুমু খেলাম, চখের জলে সমস্ত মুখ ভিজে গেল, তাকে দুই হাতে বুকের কাছে এনে ব'ল্লাম 'মা আমার, নারায়ণী আমার, তোরি কথা রাখব—আজ থেকে ক্ষমা ক'রবো, তোর মুখ মনে ক'রে ক্ষমা ক'রবো তোর বুড়ো বাবা আর ভুল ক'রবেনা।

"লছমী হাসিমুখে সংসারকে ক্ষমা ক'রে চ'লে গেছে—আর আমাকে ক্ষমা করবার পড়া দিয়ে গেছে। বুড়ো বয়সে পড়া মুখস্থ হ'চ্চেনা, কেবলি ভুল হ'য়ে যাচ্ছে। যদি ক্ষমার দেবতার শরণ নিয়ে লছমীর দেওয়া পড়া মুখস্থ করিতে পারি,—সেই চেষ্টা ক'চ্ছিলাম।" বলিয়া আনন্দরাম তানপুরা তুলিয়া কম্পিত অঙ্গুলীতে সুর দিয়া ভাঙ্গা গলায় গাইয়া উঠিল—

"তুহারি পদারবিন্দ ভরসা হামারি।"

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,
বাঙ্গালীটোলা, ভাগলপুর।